সময় ব্যবস্থাপনা সময়ের দাবি

মুহাম্মাদ আবদুল বাসেত

মুহাম্মদ আবদুল বাসেত, ১৯৮৮ইং সনের ১২ই মে লক্ষীপুর জেলাধীন চন্দ্রগঞ্জের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মুহাম্মদ আবদুর রব, পেশায় শিক্ষক। মাতা- মাজেদা বেগম। চার ভাই বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। শিক্ষাগত জীবনে দুটি বোর্ড পরীক্ষায় ডাবল জি পি এ ৫.০০ (এ +) প্রাপ্ত। কৃতিত্বের সাথে এল. এল. বি (অনার্স) ও এল.এল.এম ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থানসহ একাধিক বৃত্তি লাভ করে। একজন সমাজকর্মী ও সংস্কৃতির চর্চাকারী হিসেবে তিনি "আদর্শ সমাজ কল্যাণ পরিষদ, লক্ষীপুর" এর প্রতিষ্ঠাতা সহ সভাপতি ও "বাংলাদেশ শিল্প সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদে'র" সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও আইন শিক্ষার্থীদের সংগঠন "ইয়ুথ ফর পীস এন্ড জাস্টিস" এর সাবেক সভাপতি। মাসিক ক্যাম্পাস মিররের সাবেক নির্বাহী সম্পাদক। "সেন্টার ফর হিউম্যান ডেভেলপম্যান্ট এন্ড রিসার্চে'র" কো-অর্ডিনেটর এবং ত্রিলোক বাচিক পাঠশালার সদস্য। পেশাগত জীবনে তিনি একটি কনসালটেন্সি ফার্মের সি ই ও। সমাজ - সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং আত্ম মানবতার সেবায় কাজ করতে তিনি সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

লেখকের প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ "স্বপ্ন: সফলতা ও বাস্তবতা"

ইমেইল a.bashet37@gmail.com

www.pathagar.com

সময় ব্যবস্থাপনা
সময়ের দাবি

মুহাম্মদ আবদুল বাসেত

ইয়ুথ টাওয়ার, ৮২২/২ রোকেয়া সরণী, ঢাকা-১২১৬

www.pathagar.com

সময় ব্যবস্থাপনা : সময়ের দাবি
মুহাম্মদ আবদুল বাসেত
প্রকাশক : আবুল কাসেম হায়দার, **লেখালেখি**, ইয়ুথ টাওয়ার, ৮২২/২, রোকেয়া সরণী, ঢাকা-১২১৬ **গ্রন্থস্বত্ব** : লেখক, **প্রচ্ছদ** : কাব্য কারিম, **প্রথম প্রকাশ** : একুশে বইমেলা-২০১৬, **মুদ্রণে** : ফি.আ., **মূল্য** : ১২০ টাকা।
নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র : ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০। ৬৭, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, কাটাবন, ঢাকা-১২০৫।

Shomoy Babasthapona: Shomoyar Dabi
Muhammad Abdul Bashet
Published by : Abul Quasem Haider, **Lekhalekhi** 822/2 Rokeya Sarani, Dhaka-1216, Bangladesh. Copyright : Writer, **Cover Design :** Kabbo Karim, **First Edition :** Ekushe Book Fair-2016, Price Tk. 120 US $ 5.00

ISBN:978-984-91854-7-5

www.pathagar.com

উৎসর্গ

শ্রদ্ধাষ্পদেষু দুই মামা-
আনোয়ার হোসেন বাবুল
হারুন-অর-রশীদ

সদ্য পরলোকবাসী আপনজন
জেঠা-আবু নোমান

এবং তাঁর রেখে যাওয়া দুই সহোদর
মুহাম্মদ আবদুর রব
ও
ডা. এ টি এম রফিউদ্দিন।

www.pathagar.com

সূচি

সময় ব্যবস্থাপনা : সময়ের দাবি ৯
কর্ম ও সময় ব্যবস্থাপনা ১৪
যুগোপযোগী পরিকল্পনা : বাস্তবায়নই মূল কাজ ১৮
মনের সরলতা ও কর্মের দৃঢ়তা ২১
জ্ঞানার্জন ও কর্মসংস্থান ২৪
অপসংস্কৃতির বেড়াজালে তারুণ্যের সময় ঃ
প্রেক্ষিত প্রযুক্তির অপব্যবহার ২৮
নেতার নেতৃত্বে কর্ম ৩২
সময়ের শপথ ও স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা ৩৫
ক্ষণকালে দীর্ঘ সময়ের কাজ ৩৮
দরিদ্রতার কষাঘাতে বিপন্ন মানবতা ৪২
ভাঙা গড়ার যৌবন ৪৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের কথাঃ

কল্যাণকর; যে যাহা কিছুই করুক, চালিয়ে যাওয়া উচিত ধারাবাহিকভাবে। হতাশা ব্যর্থতাকে ডিঙিয়ে সফলতা একপর্যায়ে ধরা দেবেই। হয়তোবা তিনি সফলতার মুখ দেখে না-ও যেতে পারেন। কিন্তু ফল ভোগ করবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ "সময়"। এ সম্পদের যথাযথ মূল্যায়নকারীরাই গন্তব্যস্থলের চূড়ায় আরোহন করতে পেরেছে। সময় মানবজাতির জন্য স্রষ্টা প্রদত্ত একটি অনুকম্পা। কিন্তু সময়ের কাজ যে সময়মতো করতে পারবে না, সে সময় তার জন্য অভিশাপও হতে পারে। সে জন্য স্রষ্টাও সময়ের শপথ করে সময়ের যথাযথ ব্যবহারকারীদের চির কল্যাণকর শান্তির পথ নিশ্চিত করেছেন। আর অপচয়কারীদের ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

অমর একুশে বইমেলা-২০১৫, লেখালেখি প্রকাশনী থেকে আমার প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ "স্বপ্ন : সফলতা ও বাস্তবতা" বইটি প্রকাশ হওয়ার পর পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগে। দেশবরেণ্য কবি, সাহিত্যিক ও লেখকগণের পক্ষ থেকেও লেখালেখির কার্যক্রমকে চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ পাই। এরই ধারাবাহিকতায় পাঠকপ্রিয় বিভিন্ন পত্রিকায় আমার লেখা প্রবন্ধগুলো প্রকাশ হতে থাকে। মূলত, প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোর সমন্বয় হলো এই গ্রন্থটি।

লেখালেখির জগতে যাঁরা আমাকে বিভিন্ন সময়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন এবং সমাজসভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করতে যারা সহযোগিতার হাত অব্যাহত রেখেছেন তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

মুহাম্মদ আবদুল বাসেত
গুলশান, ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সময় ব্যবস্থাপনা : সময়ের দাবি

কিছুক্ষণের সমন্বয়ে গঠিত মানবজীবন। একেকটা সেকেন্ড নষ্ট করা মানেই জীবনের ওই অংশটুকু হারিয়ে ফেলা। ছোটবেলা যখন বিদ্যালয় পালিয়ে বেড়াতাম। মায়ের বকুনি ও বেত্রাঘাত এতোটা আঘাত দিতো না, বাবার উক্তিটি যতোটা হৃদয়স্পর্শী হতো যে, "ঠিক আছে পড়াশোনা করা লাগবে না; ও বদলা দেবে। আর ওর যে শরীর কেউতো বদলাও নেবে না"। বাবা সে সময় সমসাময়িক বেশ কয়েকজন সফল ও ব্যর্থ মানুষের নজির টানতেন। বলতেন- তাদের অবস্থান ছিল এরকম। এভাবে সময়টাকে কাজে লাগিয়ে তারা এখন বর্তমান অবস্থায়। মাঝেমধ্যে পড়াশোনায় অমনোযোগিতা ও সময় নষ্ট করা দেখে বলতো- যে সময় চলে যায়, তা আর পাবি না। একসময় আফসোস করবি আর বসে বসে কাঁদবি, তখন কোনো কাজে আসবে না। বাবার কথাগুলো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি এখন। প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে পেছনে রেখে আসা অবহেলার সময়টুকুর।

সম্প্রতি ভারতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের একাল-সেকাল "হাবাগোবা সেই ছেলেটি এখন দিল্লির শিরোমণি"। ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ দৈনিক যুগান্তরের এই প্রতিবেদনে কেজরিওয়ালের ছোটবেলা থেকেই সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টিই বেশ লক্ষণীয়। কেজরিওয়ালের বাবা ছিলেন একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। দরিদ্র পরিবারের মালিকানায় ছিল একটা স্কুটার। ছোটবেলার স্মৃতি খুব বেশি মনে নেই কেজরিওয়ালের। শনিপাত ও গাজিয়াবাদে ইংরেজি মাধ্যম মিশনারি স্কুলের পর হিসারের ক্যাম্পাস স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। তার সেসময়ের বন্ধুরা জানান, হাবাগোবা টাইপের ছেলে ছিল ও। ক্লাসের সামনের সারিতে চুপচাপ বসে থাকতো। ঘনকালো চুলের ছেলেটিকে বেশ দুর্বল লাগতো। ক্রিকেট, ফুটবলের পরিবর্তে বইপড়া ও দাবার গুটি খেলা পছন্দ করতো। ছোটবোন রঞ্জনা অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষার সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে কেজরিওয়াল সারারাত জেগে বোনকে বই পড়ে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। শিশু বয়স থেকে ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন কেজরিওয়াল। সময়ের মূল্যায়নকারী ব্যক্তিরাই সফলকাম হয়েছে। যারা সময়কে যথাযথভাবে গুরুত্ব দিয়েছে এবং সময়ের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে।

www.pathagar.com

শুরুতেই পর্যালোচনার আওতায় নিয়ে আসা বিগত দিনগুলোর সময় কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে। বাস্তবিক কাজ কতোটুকু হয়েছে আর ঘুম ও অবহেলায় কতোটুকু সময় ব্যয় হয়েছে।

এমন অনেক ঘুমপ্রেমীকে দেখেছি সকালের ঘুম এতোটুকু সময় পর্যন্ত গড়িয়েছে, ঘুমক্লান্ত যুবক আক্ষেপ করে বলে এখন সকালের নাশতা করবো না দুপুরের খাবার খাবো।

ক্লান্ত-শ্রান্ত ঘুমবীর তড়িঘড়ি করে দিনের কর্মপরিকল্পনা করে ও অন্যান্য কাজকর্মের খোঁজ নেওয়া শুরু করে। অথচ যেখানে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই কাজে মনোনিবেশের কথা ছিল। সেজন্য রাতেই পরের দিনের সময় বণ্টন করে নেওয়াই সময়ের দাবি। নিজের কর্মস্থল ও দায়িত্বের জায়গাটা যেন সময়ের অজুহাতে ব্যাঘাত না হয়। জেনে রাখা দরকার, আপনি এখন যে পর্যায়ে আছেন জীবনেও এটি আর ফিরে আসবে না। কর্মস্থল যতোই ক্ষুদ্র বা সংকীর্ণই হোক না কেন ব্যক্তির কারণেই এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মনে করতে হবে, এটি হয়তো আমার জীবনের শেষ কর্মস্থল। এখান থেকেই আমাকে জয় করে নিতে হবে।

প্রত্যেকেরই ব্যক্তিজীবনের যেমনি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা চাই, তেমনি দায়িত্ব ও কর্মস্থলের একটি স্বচ্ছ ও সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা থাকা দরকার। যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা আবার বাৎসরিক, মাসিক, দৈনিক ও ঘণ্টাসহ বিভিন্ন মেয়াদে বিন্যাস করে নেওয়াও সময়ের অপরিহার্য দাবি।

যে কথাটুকু এখন আর শুধু বুলিতে সীমাবদ্ধ নয়। সফলকাম অনেকেই তার বাস্তবতাও দেখিয়েছেন। যে কোনো কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ বাস্তবায়নের অর্ধেক। আবার পরিকল্পনার কিয়দাংশ পালন হলেও বাকি অর্ধেক বাস্তবায়িত হয়।

প্রতিক্ষণ ব্যয় হয় যেন ফলাফল ভিত্তিক। যে কাজে যতোটুকু সময় ব্যয় করবেন, তার ফলটুকুও নিতে সচেষ্ট হবেন। নচেৎ ওই সময় ব্যয় বৃথার নামান্তর হবে।

অবহেলা অসচেতনতায় না কাটিয়ে প্রতিটি ক্ষণকেই শিক্ষাপোযুক্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায়। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্জনের মাধ্যম দুটি- এক. বই পড়ে, দুই. ভ্রমণের মাধ্যমে। অনেকেই বই পড়েন বা জ্ঞানার্জন করেন শুধু চাকরি লাভের জন্য। যেটি নিছক সংকীর্ণতার পরিচায়ক। যা ব্যক্তিকে মহৎ না করে আরো সঙ্কীর্ণমনা করে তোলে। তবে ভ্রমণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান অধিক স্থায়ী ও কার্যকর। আবার অনেক অবলা শিক্ষার্জনের এ সময়টুকু কাটায় আহম্মকীতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একই সাথে দুই যাত্রী ঢাকা থেকে কক্সবাজার ভ্রমণ করে এলো। একজন আসা-যাওয়ার পথেও

www.pathagar.com

কক্সবাজার এলাকার শিক্ষনীয় বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট বিবৃতি দিলো, কিন্তু অন্যজন কিছুই বলতে পারলো না। তিনি আসা-যাওয়ার পথে ঘুমিয়েছেন বা শুধু ভ্রমণের জন্যই ভ্রমণ করেছেন। অথচ দুজনের একই সময় অতিবাহিত হয়েছে। একজন ভ্রমণকে নিয়েছেন শিক্ষনীয় হিসেবে। অন্যজন নিয়েছেন গতানুগতিক সময় অতিক্রম হিসেবে।

এভাবে জীবন চলার পথে কোনো সময় শিক্ষা ও কাজে লাগানোর বাইরে না হওয়া চাই। সময়ের প্রকৃত মূল্য অনুধাবনকারী ব্যক্তিদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোষ্ঠকাঠিন্যতায় ভোগা ব্যক্তিকে করেছে জগদ্বিখ্যাত। শৌচাগারের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সময়কে পত্রপত্রিকা পাঠ ও অন্যান্য কাজকর্মে লাগানোর মধ্য দিয়ে। ইবনে বতুতা ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ায় ৭৫ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করে হয়েছেন বিশ্ব পর্যটক। দীর্ঘদিনের দীর্ঘপথের পরিভ্রমণে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, প্রাকৃতিক বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ এবং ভয়ভীতি ইত্যাদি জানার আগ্রহ তাঁকে দমাতে পারেনি। যদিও তিনি কবি-সাহিত্যিক ছিলেন না; কিন্তু তার অনুসন্ধিৎসু ভ্রমণ শুধু কাহিনী নয়, বরং শিক্ষনীয় হিসেবে জগতবাসী স্মরণ করে রেখেছেন। একটু চিন্তা করে দেখুন, আমাদের চলার পথের দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র সময়ের ভ্রমণগুলো অন্যের জন্য না হোক, কতোটুকু নিজের জন্য স্মরণীয় ও শিক্ষনীয় করে রাখতে পেরেছি। এমনতো নয় যে, ইবনে বতুতা আলাদা জগতের কোনো মানুষ ছিলেন বা স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন।

বাল্যকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্ব স্ব স্থান থেকে প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও অন্যান্য দায়িত্বের স্থান থেকে শতব্যস্ততার মাঝেও সবটা কাজ সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে পেরেছেন কিনা খতিয়ে দেখা দরকার। আসলে কাজ করার জন্য প্রয়োজন কাজের মানসিকতা। এক্ষেত্রে সময়ের অজুহাতকারী বা ফাঁকিবাজদেরই কাজ। সময় ব্যবস্থাপকের চাই দৈনন্দিন কার্যকর রুটিন, যা তৈরির ক্ষেত্রে অতি আবেগী না হয়ে ধীরে ধীরে কাজের ভার বেশি গ্রহণের মানসিকতা তৈরি করা। সাময়িক লাভজনক; কিন্তু ভবিষ্যৎ অকল্যাণকর এমন কর্মসম্পাদন সময়ের দাবি নয়।

অন্যের সফলতা ও মঙ্গল দেখে খুব বেশি হতাশ ও ঈর্ষান্বিত না হয়ে তাঁর দৈনন্দিন সময় ব্যয়ের কার্যতালিকা দেখা যেতে পারে। নিজের প্রতিপক্ষ না ভেবে তাঁর কাছ থেকে অর্জনীয় দিকগুলো গ্রহণ করা। হোক না তিনি সমবয়সী বা কম বয়সী কোনো লোক। হিংসাকে যতো বেশি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, ততোই মঙ্গল। হিংসা কোথাও বিজয় হলে সেখানে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

www.pathagar.com

মাঝেমধ্যে নিজের জীবনে নষ্ট হওয়া ক্ষণগুলো একটু হলেও ভাবনায় নিয়ে আসা, এতে কিছুটা হলেও অনুশোচনা হওয়ার সাথে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অভিজ্ঞতালব্ধ উপদেশের বাণীও হতে পারে। প্রতিযোগিতার বাজারে প্রকৃত প্রতিযোগী কখনো শেষ মুহূর্তে এসে প্রস্তুতি গ্রহণ না করে; বরং অন্য প্রতিযোগীদের ঘুমিয়ে রেখে তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সচেষ্ট হন।

সমাজ উন্নয়ন বা কোনো মিশন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অতিবাহিত হওয়া সময়টুকু সবচেয়ে বড় নিঃস্বার্থ দান। অপেক্ষাকৃত স্বার্থহীন ব্যক্তিগণ স্বীয় সময় ব্যয়ের জন্য পৃথিবীবাসীর নিকট অধিক স্মরণীয়, বরণীয় ও ভাস্বর হয়ে থাকবেন। বস্তুত নিঃস্বার্থ জনকল্যাণে ব্যয় হওয়া সময়টুকু স্বীয় কল্যাণেও আসে। কারণ বৃহৎ লক্ষ্য ক্ষুদ্র লক্ষ্যের স্বাদটুকুও মিটিয়ে দেয়। বৃহৎ স্বার্থে সময় দিতে যারা বিভিন্ন কৌশলে নিজেদের আড়াল করে রাখে, অনেক সময় খালি ঝুঁড়িও তাঁদের ভাগ্যে মিলে না। যা নিতান্তই নিজের, সমাজ ও জাতির সাথে ধোঁকার নামান্তর।

অনেকেই আবার সময়কে গালি দিতে খুব বেশি অভ্যস্ত। যা স্বয়ং স্রষ্টার সাথেও বাড়াবাড়ি। সময়ের দাবি অনুযায়ী সময় ব্যবস্থাপনার অভাবে অনেককেই স্বীয় কর্মের জন্য লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়, যা ভাগ্যকে দোষারোপ করা অজ্ঞতা বৈ কিছুই নয়। অনর্থক গল্প, গীবত- চোগলখুরীসহ অন্যের সমালোচনায় যে সময়টুকু ব্যয় হয়, বাৎসরিক সময়ের যোগফল থেকে তার বিয়োগফল বের করা দরকার। তাহলে হয়তো সময়ের সঠিক পরিমাপ ও গুরুত্ব বুঝতে কিছুটা হলেও সম্ভব হবে।

স্রষ্টা প্রদত্ত সময় বিন্যাস- "যে রাত্রিকে বিশ্রাম ও দিনকে কর্মের" এর যতোটুকু ব্যতিক্রম যারা করেছে, বিজ্ঞান কর্তৃকও প্রমাণিত তাঁরা শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিজেদের ততোটুকু ক্ষতিই করেছে। সময় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্রষ্টার নীতির দিকে লক্ষ রাখা কল্যাণকর।

সময়ের ব্যবধানে অনেকেই হারিয়ে ফেলে আপনজনকে। একটু পেছনের দিকে তাকালেই দেখা যায়, শিশুকালে বেড়ে ওঠার সময় থেকে এখন পর্যন্ত কতজনের অবদান ছিল আমার জীবন সংগ্রামের সহযোগী হয়ে। হয়তো সৌজন্য আচরণের পরিবর্তে দাম্ভিক পদাচারণা তাঁদের হৃদয়ে আঘাত হেনেছে বারবার। যে বান্দার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে জানে না, সে স্রষ্টার কৃতজ্ঞ বান্দাও হতে পারে না। সময়ের লাঞ্ছনা অপদস্থতা ছাড়া তার ভাগ্যে ভালো কিছু জোটে না। হোক তিনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনেক বড়। সময়ের ব্যবধানে অনেককে দেখা যায়, বাবা-মা, আপনাজনকে ছেড়ে আলাদা ভুবন তৈরি করতে। যা তার পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও একটি বার্তা সময়ের উপযুক্ত জবাব দিতে। সেজন্য বাবা-মা, আত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে কিছু সময় ব্যয়ের রুটিন থাকা দরকার। নিজের জীবনের বেড়ে ওঠার

www.pathagar.com

পেছনে আদর-স্নেহ, সহযোগিতা পাওয়া লোকগুলোর অবদানের জাবরকাটা, যা ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত বিনয়ী ও কৃতজ্ঞ করে তোলে।

পৃথিবীকে যারা বরণ করে নিতে পেরেছেন, তারা সময়ের কাজ সময়মতোই করেছেন। সাময়িক শক্তি দিয়ে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত হবে না- যার বেগ পোহাতে হবে যুগ থেকে যুগান্তর। আবার সাময়িক কষ্ট পরবর্তী বৃহৎ ক্লান্তি থেকে পরিত্রাণেরও রয়েছে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সময়ের অভিজ্ঞতা একজন ব্যবস্থাপকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সেজন্য চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে কর্মবয়সের অভিজ্ঞতা প্রাধান্য পায় বেশি।

কথায় আছে কারো বয়স বাড়ে না বরং কমে, বাস্তবতাও তাই। দৈনিক সময় চব্বিশ ঘণ্টা শুনতে অনেক লম্বা মনে হলেও গভীর মনোনিবেশে ঘড়ির কাঁটার দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন, টিক্ টিক্ করে সময় কত দ্রুত গড়ায়। তার মানে জীবন থেকে এ সময়গুলো পার হয়ে যাচ্ছে। যা সেকেন্ড থেকে মিনিট, ঘণ্টা, সপ্তাহ, মাস, বছর, যুগ ইত্যাদি নামে নামকরণ হয়ে থাকে। যে শিশুকে দেখলাম মায়ের কোলে কাতরায়, বছরখানেকের ব্যবধানে সে এখন হাঁটে। কিছুদিন আগে যাকে দেখলাম তরতাজা, দাম্ভিক যুবক, এখন তার দাঁড়ি-চুলে পাকন ধরেছে। যার ভয়ে এক সময় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি বহির্বিশ্ব পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতো। সে এখন এবলো-থেবলো, অবলা শিশুর মতো কাঁথার নিচে ঝিমিয়ে কাতরাচ্ছে। সময়ের বাস্তবতা বুঝেছেন মহাবীর আলেকজান্ডার। তিনি বলেছেন মৃত্যুর পর সমাহিত করার সময় আমার হাত দুটো উন্মুক্ত করে রাখবে। তাহলে মানুষ বুঝতে পারবে, যে ধন-দৌলতের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছি মৃত্যুর সময় তা না নিয়ে খালি হাতেই চলে যেতে হচ্ছে। "এক সেকেন্ডের নাইরে ভরসা" গানের প্রখ্যাত শিল্পী গান পরিবেশনের মাঝে জগত সংসার ত্যাগ করে সময়ের প্রকৃতি আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

যে ক্ষুদ্র জীবনের জন্য এতো ব্যবস্থাপনা। তাহলে মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবন সাজানোর জন্য আলাদা সময় পাবো কোত্থেকে। একজন প্রকৃত সময় ব্যবস্থাপক তাঁর পার্থিব সময় ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবনেরই প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে।

www.pathagar.com

কর্ম ও সময় ব্যবস্থাপনা

কথায় আছে- তিনি সবকিছু ম্যানেজ (ব্যবস্থা) করে নিতে পারেন। এ ব্যবস্থাপনার কাজটি যিনি যতো বেশি সুচারুভাবে পালন করতে পারেন- প্রতিযোগিতার বাজারে তিনি ততো ভালো ম্যানেজার (ব্যবস্থাপক)। একজন ব্যবস্থাপকের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ "সময়"। সময়ের আলোকে কর্মপরিচালনা করাই যার নিত্যকর্ম। আবার যিনি কর্মসম্পাদন করেন তাকে বলা হয় কর্মী। জাতি হিসেবে হতভাগা এজন্য যে, জগত-সংসারে কর্মভারকে গুটি কয়েকজনের ওপর ন্যস্ত করে বাকিদের পা তুলে খাওয়ার মানসিকতা তৈরি হওয়া।

অনেকেই কাজের সকল বোঝা নিজেই বহন করে চিন্তার জগতে ঘুরপাক খান। হীনমন্যতা, সঙ্কীর্ণতা ও দোদুল্যতা তাঁকে এতোটাই চেপে ধরে যে, না পারেন অন্যদের মাঝে কার্যবণ্টন করতে বা বণ্টনকৃত কর্মকে আদায় করে নিতে। আপনি যে প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বরত আছেন; আপনার সহকর্মী বা কর্মীদের পরিচালনা করার ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রয়োজন তাদের মনমানসিকতা উপলব্ধি করার মতো শক্তি অর্জন করা।

যিনি যতো বেশি এ গুণটি অর্জন করতে পারবেন, ব্যবস্থাপনার দায়িত্বটিও তাঁর জন্য ততো সহজ হবে। ব্যতিক্রম ও লক্ষণীয় অনেক সময় কর্মীই ব্যবস্থাপককে পরিচালনা করা শুরু করে দেয়, সেটাও তাঁর জন্য নেতিবাচক কিছু নয়। বরং তিনি বুঝতে পারেন এ কর্মী থেকেও শিখার আছে বাস্তবিক অনেক কিছু। ব্যবস্থাপককে হতে হবে কৌশলী। মনে রাখতে হবে- কৌশলের নিকট পৃথিবীর যে কোনো শক্তি হার মানতে বাধ্য। প্রজ্ঞাহীন ব্যবস্থাপনা বৈরী পরিবেশ তৈরির উপলক্ষণ। সুসময়ে যাদের আনাগোনা খুব বেশি দৃষ্টিগোচরীয়-বিভিন্ন ছলচাতুরির মাধ্যমে দক্ষ ব্যবস্থাপককেও হার মানিয়ে নিতে তারা সক্ষম। ব্যবস্থাপকের চোখ-কান খোলা থাকবে মাছির মতো। আগন্তুককে দেখলেই বুঝতে পারবেন তার উদ্দেশ্য কি বা কি বলতে চান।

যে কোনো কর্ম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজন দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ। পরিকল্পিত কাজ যথোপযুক্ত ব্যক্তিদের মাঝে বণ্টন করা। পরিকল্পনা গ্রহণের সময় ও ঋতু বিবেচনীয়। একই কর্মী কিন্তু কাজ আদায়

www.pathagar.com

করে নেওয়ার ক্ষেত্রে দুজন ব্যবস্থাপকের মাঝে ব্যবধান লক্ষণীয়। একই আদেশ দুজনের মুখে দু'রকমে শোনায়। অনেক কর্মী আছেন- যিনি তার ব্যবস্থাপকের ভয়ে হয়তো কর্মসম্পাদন করেন। কিন্তু মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন না। ব্যবস্থাপককে হতে হবে চরিত্রের উত্তম পরাকাষ্ঠা যেন তাঁর কর্মীর মণিকোঠায় নিজের জায়গাটুকু করে নিতে পারেন অনায়াসে। রুচিহীন খাবার যেমনি বদহজমের কারণ, আগ্রহ ও তৃপ্তিহীন কাজও তেমনি ফলপ্রসূহীন। কাজের মাঝে নিয়ে আসতে হবে নতুনত্ব। যেন খুঁজে পাওয়া যায় আনন্দ, জীবন ও বাস্তবতা। কর্মীদের মাঝে এমন মানসিকতা তৈরি করাতে হবে যেন একটি কাজ শেষ না হতেই অন্য কাজের উদ্যোগ গ্রহণে উদগ্রিব হয়।

সর্বকাজে ফাঁকিবাজি ও অন্যের ওপর ঠেলে দেওয়ার মনোভাব যাদের প্রকট, অঙ্গুলী ইশারা দিয়ে দেওয়া পছন্দীয় অন্য কোনো মঙ্গলজনক কর্মের হাল ধরা। মনে রাখা দরকার, অকর্মণ্য ও আলসেরা যেমনি স্রষ্টার কাছে ভালো বান্দা হতে পারেনি, তেমনি আপনজনদের নিকট মর্যাদার পাত্রও হতে পারেনি। একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক তাঁর চক্ষুকে অনেক সময় আড়াল করে রাখেন, দেখেও অনেক কিছু না দেখার ভান করেন। তাঁর হৃদয় হবে পাহাড়সম, যেথায় থাকবে একই সাথে অনেককে ঠাঁই দেওয়ার পরিধি। দুঃখ-বেদনার বড় বোঝাগুলোও যেখানে পরিশোধিত হয়ে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হবে। সময় ও অবস্থার আলোকে হৃদ্যতার পরিধি কখনও বাড়বে, কখনওবা কমবে। এমন উজাড় করা ভালোবাসাও কাম্য নয়, যা প্রকারান্তরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতির কারণ হতে পারে।

ব্যবস্থাপক মাঝেমধ্যে কর্মীদের পরীক্ষা করে নিতে পারেন- কার ওপর কোন কর্মভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন; অজুহাত বা মান-অভিমানের উর্ধ্বে থেকে যে অনায়াসেই সব কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন। সময়ের গতির সাথে অনেকেই নিজের গতি হারিয়ে ফেলেন। কায়িক শ্রমের সাথে মানসিক শ্রমের বিকাশ ঘটাতে হবে। একই সময়ে একাধিক কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। অনেকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করেও যথাযথ ফসল কুড়িয়ে নিতে ব্যর্থ হন, যা কাম্য নয়। ফলাফল অর্জন করতে হবে জ্যামিতিক হারে, গাণিতিক হারে নয়।

কর্ম ব্যক্তির মানসিক ও চিন্তাশক্তিকে বৃদ্ধি করে। অলস মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে থাকে, যা ব্যক্তির উদ্ভাবনী শক্তিকে সমূলে নাশ করে দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। প্রবাদ আছে "বেকারের মাথা শয়তানের দোকান"। এমন অনেক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সাথে আলাপচারিতায় ফুটে উঠেছে- উচ্চ ডিগ্রিধারী নয়, বরং অপেক্ষাকৃত কর্মঠ, অভিজ্ঞ ও নিজ থেকে কাজ বের করতে পারে এমন কর্মীকেই খুঁজছে তাঁরা।

www.pathagar.com

"ধরি মাছ, না ছুঁই পানি"। এ স্বভাবের যাঁরা- সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব, আপনজনতো বটেই, একসময় কর্মই তাঁদের ঠেলে রাখে অনেক দূরে। কর্মঠের কাজের অভাব হয় না ও বৃথা যায় না সময়। যে কোনো পরিবেশেই সে নিজেকে উপযোগী করে নিতে পারে। বাস্তবতাও এমনি যাকে দিয়ে জীবনের প্রথম কর্ম যথাযথ পালন হয়নি, পরবর্তী অন্য যে কোনো দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে পেরেছেন- এমন রেকর্ড খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কর্ম সাধনের জন্য খুব বেশি যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না, দরকার পেরেশানি। কর্মই তার কর্মীকে করে তোলে যোগ্য ও অভিজ্ঞ।

"সুবিধাবাদ-জিন্দাবাদ যাঁরা"। নিজেতো কোনো কাজে ঝোঁকেই না। যারা কর্মের দিকে একটু হামাগুড়ি দিতে চেষ্টা করে, পেছন দিক থেকে টেনে ধরে তাদের। শুধু তাই নয়, এমন কিছু বুলি মুখে আওড়াতে বাধে না তাঁদের- "আরে এটি অমুকের কাজ, তুমি করো কেন?" স্বপ্রণোদিত কর্মইচ্ছুকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন তিনি পৃথিবীর সেরা বোকাদের মাঝে অন্যতম। ধ্বংসের অতল গহ্বরে পৌঁছেও ক্ষ্যান্ত নয় যাঁরা, অন্যকেও সঙ্গী করে শেষ স্বাদটুকুও উসুল করে নিতে চায় তাঁরা। একটু খিদখিদে হিংসুটে স্বভাবের স্বল্প প্রাণের অধিকারী যাঁরা- অন্যের মঙ্গল নিতান্তই যাঁদের অকল্যাণকর। এটি দোষ নয়, রিপুর তাড়নার ওপর বিজয়ী হতে পারেননি তাঁরা। সময়ের সাক্ষ্য নিতে হবে সফলকামী ব্যক্তিদের জীবনাচরণ থেকে।

সময় পরিক্রমায় পৃথিবী তাদেরই স্মরণীয় ও বরণীয় করে রেখেছে- অন্যের গতিতে যাঁদের গতি সঞ্চালন হয়নি। বরং তাঁদের গতিতে অন্যের গতি নির্ধারিত হয়েছে। গুরুত্বহীন অনেক বড় কর্মও মানুষকে মহৎ করতে পারে না। কিন্তু একটি তুচ্ছ কর্মও সফলতার হাতছানি দিতে পারে। সম্প্রতি ভারতের মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী 'স্মৃতি ইরানি' বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের এক সম্মেলনে শ্রমের মর্যাদার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন- "আমি ১৫ বছর আগে মুম্বাইয়ের এক হোটেলে থালা-বাসন ধোয়ার কাজ করেছি"।

নিজেকে সময়ের ফ্রেমে আবদ্ধ না রেখে বরং সময়কে নিজের ফ্রেমে আবদ্ধ করে নিতে হবে। সময় পাইনি বা হাতে সময় কম ছিল- অকর্মণ্যদের একটি সাধারণ অভিযোগ। কর্ম সময়কে খুঁজবে না, সময়ই কর্মকে খুঁজে নেবে। কোনো সময় এরূপ অতিবাহিত হবে না, যার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে।

অনেকগুলো কর্মপরিকল্পনা একসাথে নিয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কার চেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা ভালোভাবে সম্পন্ন করাই শ্রেয়। যখন যে কাজটুকু হাতে নেবেন তা ভালো করেই শেষ করতে চেষ্টা করবেন। আবার সকলকে দিয়ে সমভাবে সকল কাজ করাও সম্ভব নয়। মনে

www.pathagar.com

রাখবেন, যে ১০ কেজি ভার বহন করতে পারে, তাঁকে ২০ কেজি ওজন দেবেন কিভাবে? আবার যে ২০ কেজির ভার বহন করতে সক্ষমতা রাখে, তাঁকে ১০ কেজির ভার দেবেন কেন? যেখানে যে কর্মে নিয়োজিত, সময়ের আলোকে এমন কিছু নতুনত্ব ও অভিনত্ব আনয়ন করা, যার সুফল ভোগ করা যাবে অনাদিকাল, বিজ্ঞানের ভাষায়- তা Invention না হলেও Discovery হতে পারে।

অনর্থক আরাম-আয়েশের জন্য স্রষ্টা তাঁর দেওয়া বিরাট সম্পদ 'সময়' আমাদের জন্য বরাদ্দ করেননি। বরং সুচিন্তিত পরিকল্পনা, পরিশ্রম ও কর্মের মধ্য দিয়ে যেটুকু সফলতা পাওয়া যাবে সেটুকুই প্রকৃত প্রশান্তির। ৮৪ বছর বয়সের ভারতের সাবেক সফল রাষ্ট্রপতি 'এপিজে আবুল কালাম আজাদ' মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গভীর সাধনা করে গেছেন, তাঁর জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ছিল না। তাঁর কথায়, "প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক মুহূর্ত আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক বছরের ১ জানুয়ারি আমি সারা বছরে আমার লক্ষ্যস্থির করে নিই। আর সেই হিসাবেই কাজ শুরু করি। আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যা পরিকল্পনা করেছিলাম তার ৬০-৭০ শতাংশই অর্জন করেছি"। (নয়াদিগন্ত)। কবি নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, জসিম উদদীন ও ফররুখেরা জগত ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু সময় তাঁদের ছেড়ে দিতে পারেনি, করেছে মহান। কর্মের সাক্ষী হয়ে থাকবেন তাঁরা পৃথিবীর আয়ুষ্কাল পর্যন্ত।

www.pathagar.com

যুগোপযোগী পরিকল্পনা : বাস্তবায়নই মূল কাজ

"আমি কোনোকিছু করার সিদ্ধান্ত নিলে, জীবন দিয়ে তা করার চেষ্টা করি। সারা দুনিয়া তার বিরুদ্ধে গেলেও আমি তা করে ছাড়ি। যদি আমার কাছে তা সঠিক মনে হয়। আমি মনে করি, এটাই নেতার কাজ।" এরূপ উক্তি করা তারই সাজে, যিনি এর বাস্তবতাও দেখিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন সম্প্রতি মৃত্যুবরণকারী আধুনিক সিঙ্গাপুরের জনক 'লি কুয়ান ইউ'। দুর্নীতি ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত মাত্র ৭১৬ বর্গকিলোমিটার আয়তনের প্রাকৃতিক সম্পদহীন এই দ্বীপটি এখন এশিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র। তাঁর নেতৃত্বেই ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি থেকে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ মাথাপিছু আয়ের দেশে রূপান্তর হয়েছে রাষ্ট্রটি। শুধু এতোটুকুতেই ক্ষ্যান্ত নয়। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বলবৎ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাও প্রতিষ্ঠা করেছেন।

যুগোপযোগী পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত ড. মাহাথির মোহাম্মদকে সহযোগিতা করেছে বন-জঙ্গলে ঘেরা মালয়েশিয়াকে বর্তমান অবস্থায় পৌছাতে। যে কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে চাই যুগোপযোগী ও কার্যকর পরিকল্পনা। যেটি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদিও হতে পারে। সকল পরিকল্পনার একক হবে দিন। একেকটা দিন পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে পরিকল্পনা কতোটুকু সফল হচ্ছে বা হওয়ার পথে এবং পরিকল্পনাটি কতোটুকু বাস্তব উপযোগী।

পরিকল্পনা গ্রহণের শুরুতেই ঠিক করা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছি, কোথায় যেতে চাই, কিভাবে যাবো এবং সিদ্ধি অর্জনে কোন পথটি সঠিক ও যুগোপযোগী। লক্ষ্য ঠিক করতে গিয়েই যদি বাস্তবায়নের সময়টুকুই হারিয়ে ফেলি, সেটি হবে নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ। যেজন্য এখনই সময় লক্ষ্য ঠিক করার ও বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের।

আজকের পরিবেশ ও আবহাওয়া, পরিকল্পনা গ্রহণকারীদের মন-মগজ, চিন্তাধারা পরবর্তী প্রজন্মের সাথে কখনও সামঞ্জস্য হবে না। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণে বিষয়টি বিবেচ্য। স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের গুরুভার বর্তায় পরবর্তী প্রজন্মের ওপর। পরিকল্পনা গ্রহণে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবার এটি সহজ একটি কাজ। সেজন্য পরিকল্পনা গ্রহণে এমন কোনো পরামর্শ কাম্য নয়, যা সংশ্লিষ্ট

www.pathagar.com

ব্যক্তির পক্ষেও করাটা অসম্ভব। অথবা ওই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হলে নানা অজুহাতে ঘিরে রাখবে তাঁকে।
যা না বললেই নয়- এমন অনেক পরিকল্পনাও দেখেছি, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই ছিল যেটি স্থির; এক প্রজন্মের পরে অন্য প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছেনি তার গন্তব্য। কাগজকলমেই সীমাবদ্ধ ছিল তার দৌড়। পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে যতো আবেগ-অনুপ্রেরণা, ত্যাগ ও বেগ পোহাতে হয়; বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তার অনেকটাই হারিয়ে যায়। অনেকেই আবার নেতিবাচক কথা শুনতে খুব বেশি অভ্যস্ত নয়। অথচ পরিকল্পনা গ্রহণে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়টি বিবেচ্য। শুধু সমালোচনার জন্যই এ আলোচনা নয়; বরং অতীত ও বাস্তবতা থেকে শিক্ষা অর্জনই মুখ্য।

লক্ষ্য বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক- সংকীর্ণ মানসিকতা। যে নিজেকে গুটিয়ে রেখে স্বপ্নরাজ্যে শুধু স্বীয় কল্যাণেই মগ্ন, বৃহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণে অংশীদার হওয়া তার জন্য অশোভনীয়।

গতানুগতিক চিন্তাভাবনা ও কাজ সময়ের সাথে তালমিলিয়ে একটু একটু অগ্রসরের মাধ্যমে সফলতার পরিধি বৃদ্ধি পেতে পারে; কিন্তু বৃহৎ লক্ষ্য বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব নয়। চিন্তার জগত যতো গভীর ও প্রসার হবে, পরিকল্পনা হবে ততো স্বচ্ছ ও ফলপ্রসূ। যেমনটি ঘটেছিল ২৩ বছর বয়সী চিন্তামগ্ন 'আইজ্যাক নিউটনে'-এর মাথায় আপেল ছিঁড়ে পড়ার মধ্য দিয়ে। যা তাঁকে সহায়তা করেছে 'অভিকর্ষ তত্ত্ব' সহ বিজ্ঞানের জগতে নব নব আবিষ্কারের পরিকল্পনা গ্রহণের। সে জন্য যে তার মনকে যতো মহৎ করতে পারবে, পরিকল্পনা গ্রহণ ও আবিষ্কারে তিনি ততো আন্তরিক হবেন। স্বার্থপরতা, এককেন্দ্রিকতা ও অন্ধত্ব যাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারে না।

পরিকল্পনা গ্রহণে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন- বাস্তবায়নের মানসিকতা ও কর্মপন্থা তৈরি করা। আমিত্ব স্বভাব বাদ দেয়া। আমি শব্দের যথাসম্ভব প্রয়োগ কমিয়ে আনা। শব্দটির অধিক ব্যবহার ধীরে ধীরে অন্যদের থেকে নিজেকে আড়াল করে দেয়। এতে স্রষ্টার করুণা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। কথায় আছে "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ"। বৃহৎ লক্ষ্য এককভাবে নয়, বরং সামগ্রিকভাবেই বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব। কারণ মতামতে সর্বসম্মতি বা ঐক্যমতে শয়তান প্ররোচনা প্রদানেও সুযোগ পায় কম।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্ত খুঁটির প্রয়োজন। শত প্রতিকূল পরিবেশে লক্ষ্য বাস্তবায়নে যাঁকে বিন্দুমাত্র নড়াতে পারে না। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ খুঁটি প্রস্তুত রাখতে হবে বাস্তবায়নের সময়কাল পর্যন্ত। পরিকল্পনাকে বাৎসরিক, মাসিক, দৈনিক ইত্যাদি আকারে ভাগ করে প্রতিদিনের কর্মবিন্যাস থাকবে টেবিলে, যা ব্যক্তির মনকে কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে বাস্তবায়ন পর্যন্ত। নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কাজ শেষ না হলে পরবর্তী পরিকল্পিত সময় থেকে কিছু সময় গ্রহণ

www.pathagar.com

করে ভারসাম্যতা নিয়ে আসা। যেমনি ঘটে পরীক্ষার হলে। কোনো প্রশ্নের উত্তর শেষ করতে অনেক ক্ষেত্রে অন্য প্রশ্নের বরাদ্দকৃত সময় থেকে কিছু সময় নিতে হয়। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিমত ও পরিপক্ব ব্যক্তি দিয়েই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। যেমনটি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক আইজ্যাক নিউটনের মা। চাষাবাদ ও খামারের কাজ দিয়ে তাঁর মা কখনই তাঁর থেকে যথার্থভাবে কাজ আদায় করে নিতে পারেননি। নিউটনের মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ কর্মে তাঁর ছেলে নির্বোধ-অকর্মণ্য।

অলসতা ও অবহেলায় দৈনন্দিন যে সময়টুকু নষ্ট হয়, পরিকল্পনায় সে সময়টুকু আওতাভুক্ত করে নেওয়া। লক্ষ্য বাস্তবায়নে সময়ের গুরুত্ব বুঝতে গিয়ে স্রষ্টাও নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর উপাসনা করার পর বসে না থেকে জমিনে কর্মে মনোনিবেশ হতে।

সিদ্ধি অর্জনের জন্য প্রয়োজনে শারীরিক ও মানসিক ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বড় ধরনের পরীক্ষা বা আপদের সম্মুখীন হওয়ার মানসিকতা যাঁরা তৈরি করতে না পারবে; বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হাত না জাগানোই তাঁদের ভালো।

অনড় মনোবল ও দৃঢ়তা, দীর্ঘ কারাবাস- নেলসন ম্যান্ডেলাকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ উচ্ছেদের যুগোপযোগী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের পথ থেকে বিন্দুমাত্র নড়াতে পারেনি। সুদীর্ঘ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জেলজীবনেও ছিলেন না স্থির, লিখেছেন "লং ওয়াক টু ফ্রিডম"। বইটির শেষ অংশে তিনি লিখেছেন "স্বাধীনতার জন্য আমাকে দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হয়েছে"। অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে আমি স্বাধীনতার সুউচ্চ পাহাড়ে আরোহন করেছি। পাহাড়ে উঠে দেখতে পেলাম, আশপাশে অনেক পাহাড় আছে। সেগুলোতেও উঠতে হবে আমাকে। আমি এখন যে পাহাড়ে আছি সেটা একটু বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা মাত্র। আমাকে ছুটতে হবে আরো অনেক দূর। এ পথে আসবে অনেক বাধা-বিপত্তি, তবুও আমাকে ছুটতে হবে। নেই কোনো সুযোগ বিশ্রাম নেওয়ার। স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিছু দায়িত্ব, সে দায়িত্ব পালন করে আমাকে আরো অনেক দূর যেতে হবে। আমার পথ এখনও হয়নি শেষ"।

সাময়িক ব্যর্থতা, হতাশা আর গ্লানি যেন চেপে ধরতে না পারে। লক্ষ্য বাস্তবায়নে লেগে থাকা। ধীরে ধীরে সময়ের পরিক্রমায় সফলতা ঠিকই ধরা দেবে। দারিদ্র্যতা, দুঃখ-কষ্ট ছাড়াও নিগ্রোরাও পিছিয়ে থাকেনি গন্তব্যে পৌঁছতে। অপরাহ উইনফ্রে হয়েছেন বিশ্বখ্যাত মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, লেখিকা ও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন ২০১৩ সালে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী হিসেবে। ব্রত বাস্তবায়নের অবিরাম সাধনা কালো চামড়ার টনি মরিসনকে করেছে নোবেল বিজয়ী বিখ্যাত লেখিকা।

www.pathagar.com

মনের সরলতা ও কর্মের দৃঢ়তা

ছোটবেলা যখন জ্ঞানী-গুণী ও জগদ্বিখ্যাত মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী পড়তাম ও কর্মকা-ের আলোচনা শুনতাম। তাঁরা খুব সহজ-সরল ও অমায়িক ছিলেন; বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে উঠতো বেশ। ভাবতাম ও চিন্তার জগতে ঘুরপাক খেতাম, এ গুণটিই কি করেছে তাঁদের বিখ্যাত ও মহৎ। পারিপার্শ্বিকতা যতোই অবলোকন করার সুযোগ হচ্ছে, চিন্তা নামক বীজের ডাল, শাখা-প্রশাখা যতোই প্রসার হচ্ছে; বাস্তবতাও তার সাথে মিল পাচ্ছে। মনের পঙ্কিলতা ও জটিলতা কর্মসম্পাদনে ব্যক্তিকে করে জটিল থেকে জটিলতর। মনের ওপর কুমন্ত্রণা ও অন্য কোনো শক্তির প্রভাব যতোই বিজয়ী হতে থাকবে; ব্যক্তির মনোবল ও কর্মের দৃঢ়তা ততো হ্রাস পেতে থাকবে। সেজন্য কর্ম যতো বেশিই হোক ও চাক্ষুস দর্শনে ইতিবাচক হলেও জটিলতা যুক্ত কর্ম বা উপাসনা স্রষ্টার কাছেও উপযোগী নয়।

এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ মানব যাঁকে সৃষ্টি না করলে জগত সৃষ্টি হতো না। খোদা প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব প্রদানের পূর্বে তাঁর অন্তরকে আরো বেশি পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে বক্ষ বিদীর্ণের মধ্য দিয়ে। যা তাঁর জীবনে শুধু একবার ঘটেনি, চারটিবার ঘটেছে। সেই শ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবী (সাঃ)-এর অমীয় বাণীগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- "নিশ্চয় প্রত্যেক কর্ম নিয়্যতের (উদ্দেশ্য) ওপর নির্ভরশীল"? যে সরল মনের অধিকারী মহামানব মানব জীবনের এমন কোনো দিক বা বিভাগ নেই, যেখানে ছিল না তাঁর অবদান ও স্বীয় জীবনে বাস্তব প্রতিফলন । কর্মের দৃঢ়তা নিজেকে করেছে সফল ও বিশ্ববাসীর জন্য অনুকরণীয় এক আদর্শ। "মাইকেল এইচ হার্টও" ভুল করেনটি শত শত মনীষীর জীবনী পর্যালোচনা করে, তাঁর লিখিত "বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী" গ্রন্থে এ মানবকে দিতে সর্বোচ্চ স্থানের মর্যাদা।

শক্ত লোহাকে মরিচা যেমনি ধীরে ধীরে খেয়ে ফেলে, ময়লা-আবর্জনার আবরণী একসময়ে স্থানের চিহ্নটুকুও যেমনি মুছে ফেলে; জটিলতাযুক্ত ও বক্র মনও একসময়ে ব্যক্তির শুধু কর্মের দৃঢ়তাই নষ্ট করে না, ভালো কর্মগুলোকেও ভেজালযুক্ত করে দেয়।

মহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থে গৃহীত সিদ্ধান্ত হয় কল্যাণকর ও প্রাচুর্যময়। শুধু স্বীয়

www.pathagar.com

কল্যাণে যে সিদ্ধান্ত; নৈতিকশক্তিও হারিয়ে যায় তা বাস্তবায়নে। কর্ম বাস্তবায়নে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের নির্ভেজালতা ও স্পষ্টতা সহকর্মীদের মাঝেও দারুণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইতিহাস যাঁদের স্মরণ করে রাখতে বাধ্য- এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী "লে ডাক থো" ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় যুদ্ধবিরতিতে বিশেষ অবদানের জন্য নোবেলে শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রাপ্তি নয় যে উদ্দেশ্যে। নির্ভেজাল মন নিয়ে কাজ করেছেন। কারণ হিসেবে সেটিই বলেছিলেন, ভিয়েতনামে এখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমি নোবেল নেবো কিভাবে? কর্মদৃঢ়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় ইসলামী আইনজ্ঞ ও প-িত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জীবনাচরণে। তৎকালীন খলিফা মনসুর কর্তৃক রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির মতো লোভনীয় পদের আহ্বান প্রত্যাখ্যানে কারান্তরীন করেও তাঁর মনোবল নড়াতে পারেনি। এমনকি খাদ্যের সাথে বিষ মিশ্রণ করে তাঁকে হত্যা করার শেষ পাঁয়তারাটুকু পর্যন্তও খলিফা বাকি রাখেননি।

অন্যের ছিদ্রান্বেষণ ও অমঙ্গল কামনায় যতোক্ষণ ক্ষেপন হবে, ততোই নিজের কল্যাণে ভাবা সময়ই নষ্ট হবে। কর্মের ক্ষেত্রে অন্যের ভুলত্রুটি যতোটুকু না আনলেই নয়, গোপন রেখে সংশোধন করাই শ্রেয়। রোজ কেয়ামতের দিনও স্রষ্টা ওই বান্দার ত্রুটি গোপন রাখবেন, যে তার সহকর্মীর ক্ষেত্রে এরূপ করেছে। এমনকি নিজের পাপাচারিতার অনুশোচনায় না নিয়ে এসে অন্যের সাথে আলাপচারিতা ধর্ম কর্তৃকও বারিত। এতে ব্যক্তি নিজেই নিজের বিপক্ষ সাক্ষী তৈরি করে নেয়। আবার এমন কর্মও কাম্য নয়, যা সমস্যাটিকে জিইয়ে রেখে-ভাইরাসে আক্রান্ত করে পুরো সমাজ ও জাতিকে। এক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ- শাসক হজরত ওমর (রা.) এর বিচার ব্যবস্থার দৃঢ়তা। স্বীয় পুত্র আবু শামাকে মদ্যপানের অভিযোগে নিজহাতে বেত্রাঘাত করেন। এমনকি বেত্রাঘাত অবস্থায় সন্তানের মৃত্যুর পর কবরের ওপর অবশিষ্ট বেত্রাঘাত করলেন। অথচ যে শাসকের মনের সরলতা ছিল এমন রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে প্রজা সাধারণের দুঃখ-কষ্ট শুনতেন। আটার বস্তা নিজের কাঁধে বহন করে অভাবী মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করতেন। এমনকি নিজের পরিচয় দিয়ে কর্তব্য অবহেলা হয়েছে বলে ক্ষমাও চেয়ে নিতেন। সফরে বৃদ্ধকে উটের পিঠে আরোহন করিয়ে নিজে উটের লাগাম ধরে টানলেন।

ইদানীংকালেও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এমন মনের অধিকারী ব্যক্তিত্বের। সদ্যবিদায়ী উরুগুয়ের রাষ্ট্রপতি 'জোস মজিকা' যাঁকে পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব রাষ্ট্রপতি ও বিনম্র নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। রাষ্ট্রপতি থাকাবস্থায়ও থাকতেন রাজধানীর বাইরে তাঁর স্ত্রীর ছোট খামারবাড়িতে। মোট বেতনের ৯০ শতাংশই ব্যয় করতেন দাতব্য কাজে। বেতনের বাকি অংশ ও স্ত্রীর কৃষি খামারের উৎপাদিত ফুল বিক্রি করেই সংসার পরিচালনা

www.pathagar.com

করতেন। এ সরলমনা লোকটিকেই দিতে হয়েছে দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পথ পাড়ি। বারবার কারাবরণ, গুলিবিদ্ধতা ও বিভিন্ন নির্যাতনেও কর্মসম্পাদনে বিন্দুমাত্রও নড়াতে পারেনি তাঁকে।

বক্রতা, কুটিলতা ও জটিলতার মতো মনোরোগে যারা আক্রান্ত; তাদের থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাদের অন্যতম গুণ আড্ডায় বেশ মজা দেওয়া। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা ও আলাপচারিতায় রাত পার করে দিলেও টের পাওয়া যায় না। কারণ কুমন্ত্রণাকারী শয়তান তখন স্বেচ্ছায় অংশীদার হয়ে যায়। আলাপচারিতার ফাঁকে মহৎ কোনো কর্মের কথা তুলে দেন। পর্যালোচনায় নিয়ে আসুন, আপনি-আমি কে কতটুকু কি করতে পেরেছি। দেখবেন মুখ মলিনতা সম্পন্ন এক বিরূপ পরিবেশ তৈরি হওয়ার উপক্রম হবে। সেজন্য স্রষ্টাও পথ শিখিয়ে দিয়েছেন; কুমন্ত্রণা দানকারী মানুষ ও জিনের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে।

মনের সরলতা, শুনতে যতোটা সহজ বাস্তবতা তার ব্যতিক্রম। মনকে সহজ ও সরল করা অনেক কঠিন একটি কাজ। নিজের আত্মার সাথে সংগ্রাম করে অনেক ঝঞ্ঝা-প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে মানবতার কল্যাণে ও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থে মনকে সরল করতে হয়। পৃথিবীতে অসৎ হওয়াটা সহজ; কিন্তু সৎ হওয়াটা সংগ্রামের। 'আব্রাহাম লিঙ্কন' তাঁর সন্তানের শিক্ষককে চিঠি লিখেছেন এভাবে, "আমার পুত্রকে জ্ঞানার্জনের জন্য আপনার কাছে পাঠালাম, তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন। এটাই আপনার কাছে আমার বিশেষ দাবি। আমার পুত্রকে অবশ্যই শেখাবেন-সব মানুষই ন্যায়পরায়ণ নয়, সব মানুষই সত্যনিষ্ঠ নয়। তাকে এও শেখাবেন- প্রত্যেক বদমায়েশের মাঝেও একজন বীর থাকতে পারে। প্রত্যেক স্বার্থপরের মাঝেও একজন নেতা থাকতে পারে। তাকে এও শেখাবেন- প্রত্যেক শত্রুর মাঝে একজন বন্ধু থাকে।

মনের সরলতা হয়তো বা সাময়িকভাবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বড় ধরনের আপদের কারণও হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিকতা ও মানুষের কিছু উক্তি বা ধারণাও মনের ওপর বৈরী প্রভাবও ফেলতে পারে। এরূপ যন্ত্রণা-বেদনা হজম করার মতো মানসিকতা তৈরি করতে হবে। বিখ্যাত দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধসহ হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার ও এর ব্যবহারের বিরোধিতা করে শান্তির পক্ষে স্লোগান তোলার কারণে একাধিকবার কারাবরণ করতে হয়েছে। এমনকি তাঁর চাকরিও হারাতে হয়েছে।

www.pathagar.com

জ্ঞানার্জন ও কর্মসংস্থান

সদ্য একাডেমিক পড়ালেখা সমাপ্তকারী বা দীর্ঘদিন যাবৎ চাকরিপ্রার্থী এমন অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর মিলনস্থল জাতীয় গ্রন্থাগার। জ্ঞানসাধনার সুবাদে যতোবারই সেখানে যাওয়ার সুযোগ ?য়েছে; শুধু বড় বড় নিঃশ্বেষ ফেলাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছে। এমন অসংখ্য শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি, যে কোনোভাবে একটি কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। অনার্স-মাস্টার্স ডিগ্রি শেষ, বাপ-মা অনেক বুকভরা আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে; সন্তান কি করছে বা কি করবে? দুপুরে কেন্টিনে আলুভর্তা/ডাল দিয়ে মাথা নিচু করে খাবার গ্রহণের অসংখ্য নজির ও বাস্তবতা দেখার সুযোগ হয়েছে। বড় বেশি আফসোস হতো ছাত্রী-বোনদের খাবারের কষ্ট দেখে, হয়তোবা মেস বা হোস্টেলের আগের রাতের খাবার বা সকালের নাশতাকে দ্বিগুণ করে দুপুরের খাবারের টিফিনে করে কোনো উপায়ে ক্ষুধা নিবারণ করা।

সকাল ৮টা থেকে রাত পৌনে ৯টা পর্যন্ত লাইব্রেরির পড়ার টেবিলে পড়ে থাকতে দেখা গেছে অসংখ্য শিক্ষার্থীকে। যে পড়ালেখা আসলে কোনো জ্ঞানসাধনার ব্রত হয়ে নয়, বরং শুধু ভালো একটি চাকরি পাওয়ার জন্য গলধকরণ। কিন্তু বড় বেশি আফসোস ও দুঃখের বিষয় কোনোমতে একটি চাকরির ব্যবস্থা হলেই শিক্ষার্থীরা ভুলে যায় জ্ঞানসাধনা বা পড়ালেখায় ব্যয় করে অতীত সময়ের পরিসংখ্যানটুকু। অথচ শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু চাকরিতে সীমাবদ্ধ নয়, যে শিক্ষার আলোয় এ সমাজ আলোকিত হবে। পথহীন মানব পথের সন্ধান পাবে।

যে জ্ঞান প্রদীপে জ্ঞানী নিজেকে যেমনিভাবে পরিচালিত করবে, তেমনি সমাজের অবহেলিত-অত্যাচারিত মানবতাকেও পথের সন্ধান দেবে ও পরিচালিত করবে। জ্ঞান আত্মকেন্দ্রিক নয়, এবং যার পরিধিও সংকীর্ণ নয়।

জ্ঞানের মর্ম উপলব্ধি না করে ও জ্ঞানসাধনায় না ঝুঁকে শিক্ষার্থীরা এমনকি অভিভাবকরাও ঝুঁকে পড়েছে বিভিন্ন লোভনীয় চাকরি ও আকর্ষণীয় বেতনের দিকে। কোর্স ও পাঠ্যক্রম তৈরি হচ্ছে চাকরির ওপর ভিত্তি করে। বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজনরা সন্তানাদির ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে- তাদের

www.pathagar.com

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল বা অন্য কিছু বানাবে, যাতে অর্থ-সম্পদশালী হবে। সেজন্য সন্তানাদিও ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা উকিইলই হয়, কিন্তু দক্ষ মানবসম্পদ ও ভালো সন্তানে রূপান্তর হয় না।

জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থল- বিদ্যালয় যেখান থেকে জ্ঞানী-গুণী বের হয়। সে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশায় অপেক্ষাকৃত কম জ্ঞানীরাই ঝুঁকছে। যাদিও বরাবর অভিযোগ তোলা হচ্ছে, সম্মানজনক ও মহান পেশা হলেও শিক্ষকদের করা হচ্ছে না সঠিক কদর। খতিয়ে দেখার বা তার যথাবিহিত পদক্ষেপ গ্রহণেরও নেই যথাযথ কেউ।

অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী দেশের কর্মসংস্থানের প্রতি হতাশা; অনেকটা অর্থের লোভে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার মধ্য দিয়ে যেমনি দেশ হচ্ছে মেধাশূন্য, তেমনি অনেকেই সর্বস্বান্ত হারিয়ে ফিরছে দেশে। প্রবাসী অর্থ আমাদের দেশের জন্য অনেক বড় সম্পদ, কিন্তু কেন? বিদেশিরা আমাদের সস্তা শ্রম পুঁজি করে তার থেকেও বেশি লাভবান হচ্ছে অথবা সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে পরনির্ভরতা কমিয়ে দেশকে আরো উন্নতির দিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

আমাদের শিক্ষার আরো বড় আপদ- একাডেমিক অর্জিত শিক্ষা সম্পর্কিত কর্মসংস্থানের অভাব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে এক বিভাগে পড়ুয়া শিক্ষার্থী কাজ করছে অন্য বিভাগে। দীর্ঘ পনেরো-ষোল বছরের পড়ালেখা কি কাজে লাগলো। শিক্ষার্থীদের মনে এমন ভাবনা গজিয়ে দেওয়া উচিত, পড়ালেখা শেষ করে চাকরিপ্রার্থী না হয়ে স্বীয় শিক্ষা-সম্পর্কিত কর্মসংস্থানের তৈরি করবে। যা শুধু তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নয়, অন্য বেকারদেরও ঠাঁই হবে।

এমনও অনেক উচ্চতর ডিগ্রিধারী পাওয়া যায়- যিনি চাকরিপ্রার্থী হন তাঁর ?কেও কম ডিগ্রিধারী মালিকের প্রতিষ্ঠানে। তবে হ্যাঁ, অভিজ্ঞতা যেহেতু বড় একটি সম্পদ; এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হবে কর্মসংস্থানের আরো বড় ক্ষেত্র তৈরির প্রয়াস।

বর্তমানে আমাদের শিক্ষিত সমাজে সবচেয়ে অভাব- গবেষণাগার ও গবেষকের। গবেষণা ও জ্ঞানার্জনে অধিক সময় ব্যয় করা যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে মুষ্টিমেয় লোকের কাজ। এমনকি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক পেশার সাথে জড়িত মহামান্যদের মাঝেও এক্ষেত্রে উদাসীনতা ব্যাপকহারে লক্ষণীয়। অর্থ ও লোভ-লালসার প্রতি দৌড়ঝাঁপ এবং এটিই যেন জীবনের সব। জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণা ও গবেষণার বাস্তব নজির দেখতে আমাদের পূর্ব পুরুষদের দিকে যদি একটু তাকিয়ে দেখি- তুর্কির অধ্যাপক ইসমাইল পাশা 'ইবনোল হাইছামের' লিখিত একশত সাতচল্লিশটি গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানেই এগারোটি। বিখ্যাত

www.pathagar.com

দার্শনিক 'জাবির ইবনে হাইওয়ানে'র লিখিত ছোট-বড় দুই হাজারেরও বেশি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দর্শনশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা ও ভাগ্যলিপি সম্বন্ধীয় শাস্ত্রের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। যদিও তাঁদের কিছু কিছু প্রবন্ধকে একেকটি গ্রন্থ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। দার্শনিক 'আল-ফারাবী' সত্তরটি ভাষা জানতেন। শতাধিক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। 'আল-কিন্দি' বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দুইশত পঁয়ষট্টিখানা গ্রন্থ লিখেছেন।

'আল বেরুনী'- গণিত, জ্যোতিষ, পুরাতত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, ভূগোল, রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর একশত চুয়াল্লিশটি গ্রন্থ লিখেছেন। 'ইবনে সিনা'- সাহিত্য, দর্শন, বীজগণিত, জ্যামিতি ও রসায়নে ছোট-বড় মিলে একশত পঁচিশটি গ্রন্থ নিখেছেন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন হলে আজো স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে তাঁকে। আব্বাসীয় যুগে 'ইবনে সিনা'র চিকিৎসাশাস্ত্র "কানুন ফিত তিব্ব" বিশ্ব জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে কিভাবে সম্ভব হলো তাঁদের পক্ষে অসম্ভবনীয় এসব কর্মসম্পাদন করার। শুধু কর্মসংস্থান বা জীবিকা উপার্জনের জন্য তাঁরা কি কর্ম করেছিল ? কতটুকু সময় তাঁরা দিয়েছিলেন? যা তাঁদের আজ জগদ্বিখ্যাতদের আসনে সমাসীন করেছে। তাঁদের লিখিত গ্রন্থের ওপর আজ পর্যন্ত অসংখ্য শিক্ষার্থী জ্ঞানান্বেষণ ও গবেষণা করছে। হয়তো তাঁদের সমসাময়িক আরো অনেক জ্ঞানী-পি-তও জীবিত ছিল- যা তাঁদের এ আসনে সমাসীন করেনি।

যদি তাঁদের শ্রমের সমসাময়িক পারিশ্রমিকের কথা চিন্তা করি, হয়তো তাঁরা পাননি বা সামান্যতম সৌজন্যবোধও নয়। কিন্তু তাঁদের পরিশ্রমের ফল বয়ে বেড়াচ্ছে যুগ থেকে যুগান্তর। ক্ষুদ্র ও স্বীয় স্বার্থ বিবেচনায় যাঁরা সবসময় ঘুরপাক খাচ্ছে সাময়িক সুবিধাটুকু নিয়ে- মাছের মতো বড়শির খাবার গিলেই তৃপ্তির ঢেঁকুর গিলতে চায় তাঁরা। তবে হ্যাঁ জ্ঞানপিপাসুদের বাস্তব নজির এমনও রয়েছে অর্ধাহারে-অনাহারে যাঁদের জীবনটুকু পর্যন্তও দিয়ে দিতে হয়েছে। সাময়িক লাভ, অনৈতিক ও অর্থ লোভ তাঁদের একবিন্দু পর্যন্তও সাধনা থেকে নড়াতে পারেন।

জ্ঞানার্জন শুধু একাডেমিক বই-পুস্তকেই সীমাবদ্ধ নয়। নারীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি লক্ষণীয়। কোনোভাবে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারলেই স্বামীর বা বাপের পক্ষ থেকে মানসিকতাটা যেন এমন হয়ে দাঁড়ায় পড়ালেখার কথা বলাও পাপ। বিয়ের আগে কোন একদিন টেবিলের কোণে বইগুলো যেমনি রেখে এসেছে, এখন আর ধরাছোঁয়ারও কেউ নেই। দুর্ভাগ্যবশত একসময়ে বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থলেও এদের স্থান হতে দেরি হয় না। সমাজটা নারী জাতিকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে বিয়ে মানেই

www.pathagar.com

অন্যের অধীনে চলে যাওয়া, স্বামীর ঘরসংসারেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকা। সৃজনশীলতা ও নিজের মতো কোনো কর্মসৃষ্টির প্রয়াস ঘটানো বা গবেষণালব্ধ কর্মে নিজেকে সম্পৃক্ত করার ভাবনাটাও যেন বিপদ। যেখানে জনৈক দার্শনিকের উক্তি,"আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব"। যে মায়ের জ্ঞানান্বেষণের শেষ হয়েছে জ্ঞানের মর্ম অনুধাবনের পূর্বেই, যে মা পরের সংসারের যাঁতাকলে অর্জিত জ্ঞানটুকুও হারিয়ে যাওয়ার পথে, সে মা কিভাবে তাঁর সন্তানকে জ্ঞানের মর্ম উপলব্ধি করাবে। অনেক পরিবারেই দেখা যাচ্ছে বাবা-মায়ের শিক্ষার বা জ্ঞানের মর্ম উপলব্ধির অভাবে ছেলে-সন্তানাদি একটু রড় হলেই পড়ালেখা বন্ধ করে, বিভিন্ন কর্মে লাগিয়ে দেওয়ার প্রবণতা। যা গ্রাম থেকে এখন শহরাঞ্চলেও লক্ষণীয়। ফলশ্রুতিতে শিশুশ্রমের হারও বৃদ্ধি পা?চ্ছে অত্যধিক হারে।

আবার জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য শুধু ভালো চাকরি ও কর্মসংস্থান নয়। অনুতাপের বিষয় ইদানীং আমাদের পাঠ্যসূচিও এমনভাবে তৈরি হচ্ছে ভালো চাকরি ও উচ্চতর বেতনের দিকে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণীয় করা হচ্ছে। কর্মজীবনে যে যেই কর্মেই থাকুক, প্রত্যেকের জন্য ছোট-বড় একটি লাইব্রেরি থাকা প্রয়োজন। যেখান থেকে জ্ঞানের প্রকৃত স্বাদ আচ্ছাদন করবে। মানবতার কল্যাণে কাজ করার যেমনি অনুপ্রেরণা পাবে, তেমনি অর্জিত জ্ঞানানুযায়ী সমাজের অবহেলিত মানুষের জন্য কিছু করার জন্য উৎসাহিত হবে। তাহলেই জ্ঞানার্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

www.pathagar.com

অপসংস্কৃতির বেড়াজালে তারুণ্যের সময় ঃ প্রেক্ষিত প্রযুক্তির অপব্যবহার

শুরুতেই বলে নিতে চাই- এ নিবন্ধে কলাম ধরা গতানুগতিক কোনো উদ্দেশ্যে বা লেখালেখির ধারাবাহিকতা থেকেও নয়। আমাদের সংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের বর্ণনাও মুখ্য নয়। আমি চাই একটি শক্ত প্লাটফর্ম। যেখান থেকে সত্যিকারের ঝড় উঠবে প্রযুক্তির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে। আশু সমাধানে শুধু কাম্য না হয়ে বাস্তবিক ফলাফল চাই। প্রযুক্তির নিত্যব্যবহার এমন হয়ে উঠেছে, প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মূল উদ্দেশ্যই সেখানে প্রতিনিয়ত ব্যাহত হচ্ছে। প্রযুক্তির অপব্যবহারই যেন এখন প্রযুক্তির ব্যবহার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তরুণ সমাজ নয়, শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত যা এখন কৌতুহল ও আকর্ষণের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। আমি এর জন্য অপব্যবহারে সময় নষ্টকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে দায়ী না করে প্রযুক্তির কলকব্জা নাড়াচাড়াকারী প্রযুক্তিবিদদেরই দায়ী করবো।

মুষ্টিমেয়, যারা প্রযুক্তিকে এমনভাবে সাজিয়েছে তরুণ সমাজ নয় শুধু যে কোনো বয়সের ব্যক্তিরাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনকি দিনের পর দিনও অতিক্রম করতে অনেকটা বাধ্য হয়। বিশেষ করে গুগল ও ইউটিউবকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, ব্যবহারকারীরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অপব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। হয়তো আমরা স্লোগান-লেখনী বা বক্তৃতার মাধ্যমে প্রতিবাদ করে থাকি। প্রায়শ বলা হয়ে থাকে প্রযুক্তির ব্যবহারগত ভালো-মন্দ দুটি দিকই রয়েছে, যে যেভাবে গ্রহণ করতে পারে। এর সাথে আমি একমত হলেও শতভাগ নয়। আরে- ফসল বিনষ্টকারী পোকমাকড় ক্ষেত থেকে শুধু তাড়িয়ে দিলেই নয়, সমূলে করতে হয় নাশ। নচেৎ কাঙ্ক্ষিত ফসল ঘরে তোলাও অসম্ভব। যে প্রযুক্তির ব্যবহার দেখে 'আলবার্ট আইনস্টাইন' তৎকালে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, প্রযুক্তি আমাদের মানবতাকে অতিক্রম করেছে। বড় বেশি আগ্রহের বিষয় তিনি বর্তমানে জীবিত থাকলে প্রযুক্তি নিয়ে কি মন্তব্য করতেন।

প্রযুক্তির অপব্যবহারের হাওয়া সবার গায়ে যেমনি লেগেছে; সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তরুণরা। তাদের যে সময় ব্যয়ের কথা ছিল নিজেদের গোছানোর। সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিপাটি করতে। নিজেদের যোগ্যরূপে গড়ে

www.pathagar.com

তুলতে। অথচ সেটুকু সময় যাচ্ছে প্রযুক্তির অপব্যবহারে। এরূপ অপব্যবহারের উদ্বুদ্ধ ও কারসাজির প্রযুক্তিবিদরা শুধু তরুণ সমাজের সময়ই নষ্ট করে না, তারা দেশ ও জাতির শত্রুও বটে। এখনই সময় এসেছে আসল রোগ নির্ণয় করে- শুধু নিরাময় নয়, প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।

প্রযুক্তি ক্ষুদ্র কিংবা সংকীর্ণ কোনো বিষয় নয়, বরং মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে রয়েছে এর সম্পৃক্ততা ও উপকারিতা। কিন্তু মাঝেমধ্যে দুঃখ ও আফসোস হয়, সন্তানের ব্যাপারে বাবা-মায়ের অভিযোগের মাত্রা দেখে, "দরজা-জানালা বন্ধ করে, ইন্টারনেটে পড়ে থাকে"। অসংখ্য শিক্ষার্থী রয়েছে বিশেষত শহরাঞ্চলে পরিলক্ষিত। ক্যারিয়ার গড়ার মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেসবুক, গুগল ও ইউটিউবে।

সিনেমার কাহিনী, নাচ-গানে সাজসজ্জার দৃশ্য এমনভাবে নির্মিত হয়, তরুণ সমাজ বাস্তব জীবনেও এর প্রয়োগ ঘটাতে আগ্রহ দেখায়। ফলে সমাজ জীবন হচ্ছে ব্যাহত। বিয়ে সংসার বেশিদিন টিকছে না। সামান্য অজুহাত, মান-অভিমানে একে অপরকে আলাদা করে দিচ্ছে। বাড়ছে সন্দেহপ্রবণতা, কমছে বিশ্বস্ততা। ফলশ্রুতিতে বাড়ছে আত্মহত্যার প্রবণতা। বিবাহ রীতি ভেঙে- বেড়েছে লিভ টুগেদার প্রথা।

ভিন্‌দেশী নাটক সিরিয়াল দেখে নিজেদের চরিত্রে রূপ দিতে গিয়ে সংসারে নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে হারিয়ে যায় সন্তানাদি শোনে না বাবা-মায়ের কথা। কেউ মানে না কারো নিয়ন্ত্রণ। ফলে বৃহৎ পরিবারগুলো রূপান্তর হচ্ছে ক্ষুদ্র পরিবারে। হারিয়ে যেতে বসেছে পরিবারের সকলে মিলে একসাথে নাটক-সিনেমা দেখার ঐতিহ্য। অভিনয়ের প্রতিযোগিতা এমনভাবে বেড়েছে- নোংরামী ও বেহায়াপনায় যিনি যতো অগ্রসর হচ্ছেন, তিনি ততো বেশি জনপ্রিয় হচ্ছেন। অনেকে মিডিয়া জগতে নিজেকে অধিক পরিচিতি করতে মাঝেমধ্যে এমন কিছু পদক্ষেপ নেন, যা ভাষায় প্রকাশ করতেও লজ্জাবোধ হয়। পর্নোগ্রাফিতে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসহ অনেক ধনাঢ্য পরিবারের সন্তানরাও ঝুঁকছে। যা স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধিকেও হার মানিয়ে বসে। এক সময়ে শুনতাম অভাব অনটনে অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেকে এসব কর্মে জড়িত হতো। তবে হ্যাঁ, অনেকেই এটিকে বিনোদন ছাড়াও অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। অশ্লীল ভিডিও তৈরি করে ইন্টারনেটে এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যুব সমাজ এগুলো দেখে সময় পার করছে। যার প্রভাব পড়েছে সমাজ জীবনেও। অশ্লীল প্রভাবে বেড়েছে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ইত্যাদি। স্কুল-কলেজে মেয়েরা যেতে পারছে না নির্দ্বিধায়। এমনকি অভিভাবকদের সর্বদা থাকতে হচ্ছে মানসিক যন্ত্রণায়। মেয়েকে বিদ্যালয়য়ে পাঠিয়ে মা পথ চেয়ে থাকে,

www.pathagar.com

কখন এসে পৌঁছবে তাঁর সন্তান। এমনকি শিক্ষকদের কুলালসা থেকেও মুক্ত নয় ছাত্রীরা। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক নম্বর প্রদানের আশ্বাস দিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলার নজির পত্রপত্রিকায় লক্ষণীয়। আরো লোমহর্ষক বিষয় সরলমনা শিক্ষার্থীর সঙ্গে ধর্ষণের গোপন ভিডিও ধারণ করে একাধিকবার ধর্ষণে বাধ্য করার মতো ঘৃণ্যতা। পত্রপত্রিকার পাতা খুললেই শহর ও গ্রামে পাওয়া যায় তার অহরহ ঘটনা। প্রযুক্তির অপব্যবহার এমনভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের হাতে এন্ড্রয়েট মোবাইল সেট না থাকলেই যেন আধুনিকতা নয়। দুঃখের বিষয় যে সময়ে তারা বই-খাতা হাতে নিয়ে ঘুরবে, রাস্তায় চলার পথে দৈনন্দিন পড়ার বিষয় নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠবে। সেখানে মোবাইলে বিভিন্ন সিনেমার নাচ-গানসহ অশ্লীল ভিডিও লোড নিয়ে মত্ত হয়ে উঠেছে। লম্পট ধর্ষণকারীরা মেয়েদের বশে আনার হাতিয়ার হিসেবে বেচে নিয়েছে ধর্ষণের ছবি মোবাইল ও ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়া। যেটুকু পত্রপত্রিকা বা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায় কিন্তু তার বাইরেও আরো অসংখ্য ঘটনা গোপন থেকে যায়। যা ভুক্তভোগী ও তার পরিবারকে নীরবে সহ্য করে যেতে হয়।

ইন্টারনেট গুগলকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে- যেখানে যৌনতাই প্রাধান্য পেয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়- গুগলে যে কোনো অক্ষরকে সার্চ দিলেই তার সাথে যৌন সম্পর্কিত যে কোনো পোস্ট অনায়াসেই মনিটরের পর্দায় ভেসে উঠে। কাহিনী গল্পাকারে এমন কিছু স্ক্রিপ্ট ছাড়া হয়, যা সুস্থ বিবেককেও হার মানায়। নির্মমতা লজ্জার এমন নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে- এমন কি মা-বোনকে নিয়েও বাজে মন্তব্য ও পোস্ট করতে দ্বিধাবোধ হয় না। ধর্মীয় বা সময় অপচয়ের বিষয় বাদই দিলাম। এ সভ্যতাকে রক্ষা করতে এখনই সময় কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা; নেতিবাচক পোস্ট ও মন্তব্য থেকে গুগলকে রক্ষা করা।

জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তরুণরা এমনভাবে আসক্ত হয়ে পড়েছে পকেটে খাবারের পয়সার জোগাড় না থাকলেও এমভি কেনার কাজটি আগে সেরে নেয়। প্রোফাইল পাতায় অন্যের ছবি দিয়ে বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করে সম্পর্কের জাল বুনা থেকে শুরু করে চ্যাটিংয়ের নামে সম্পর্কের এমন গভীরতা ধারণ করে হয়তো উভয়পক্ষই প্রতারণা ও ধোঁকার শিকার হয়। যৌন সুরসুরি ও আবেদনময়ী এমন কিছু ছবি ও লেখা ছাড়া হয়, যা অন্য ফেসবুক বন্ধুদের অনায়াসে দেখতে বাধ্য করে। প্রতারণা, অর্থ ও সময় নষ্টের যে মাধ্যম আগে শুধু মোবাইলে সীমাবদ্ধ ছিল।

www.pathagar.com

মোবাইল ও কম্পিউটার গেমসে শিশুরা এমনভাবে মত্ত হয়ে উঠেছে, পাঠ্য বিষয়ে এখন আর মজাই পাচ্ছে না। "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি" এরকম শিক্ষণীয় কবিতা ও ছড়ার আবৃত্তির পরিবর্তে শিশুরাও এখন গুনগুনে গাইছে- "ও প্রিয়া তুমি কোথায়"। আগে দেখতাম বাবা-মায়ের সামনে উচ্চ আওয়াজে গান-বাজনা শোনা ও গাওয়াকে লজ্জাবোধ করতো। এখন সংস্কৃতি চর্চার নামে বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে ও ভাই-বোন একে অপরের নাটক সিনেমার নোংরা অভিনয় দেখতেও দ্বিধাবোধ করে না। ছোটবেলায় ভাবতাম যারা অশ্লীল অভিনয় করে, তাদের মনে হয় মা-বাবা, ভাই-বোন বা আপনজন কেউ জীবিত নেই। থাকলে তারা যদি এসব অভিনয় দেখে ফেলেন, অথচ সে মাত্রাটুকুও এখন আর সীমাবদ্ধ নেই। দিন যতো যাচ্ছে বেহায়াপনা ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটু কি চিন্তা করে দেখেছেন? এভাবে চললে আগামী প্রজন্ম অপসংস্কৃতির কোন পর্যায়ে পৌঁছবে। বিশ্বময় আলোড়ন সৃষ্টি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন। একই সাথে প্রয়োজন তরুণদের মূল্যবান সময় রক্ষা করতে প্রযুক্তির অপব্যবহার এখনই বন্ধ করা।

www.pathagar.com

নেতার নেতৃত্বে কর্ম

পৃথিবীর অদ্যাবধি যতো সাম্রাজ্য জয়ের মুখ দেখেছে, যতো অধিবাসীরা বিজয়ের হাসি হেসেছে; তার সবটুকুই নেতৃত্বের বদৌলতেই হয়েছে। যে সাম্রাজ্যে নেতৃত্বে মরিচা ধরেছে, সেখানে সাম্রাজ্য থুবড়ে পড়েছে। নেতা যেমনি কর্মপরিচালনা করেন, তেমনি নেতৃত্ব তৈরি করেন। নেতার অন্যতম গুণ- তিনি কখনও নিজেকে নিয়ে ভাবতে পারেন না বা জানেনও না। পরিবারের কর্তা থাকেন একজন। তাঁর অধীনে থাকেন একের অধিক সদস্য। কর্তার চিন্তা জগত যদি এমন সংকীর্ণ হয়- নিজে পানাহার করবেন না বলে অন্যদের নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজনই বোধ না করেন, অনায়াসে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও উপবাসেই থাকতে হয়। গ্রামাঞ্চলে বিষয়টি বেশ লক্ষণীয়। দেখা যায়, পরিবারের প্রধান দৈনিক দুইশত টাকা রোজগার করে দোকানে বা হোটেলে বসে নিজেই সবটুকু খরচ করে খালি হাতে ঘরে ফেরে। আবার একই অর্থ রোজগার করে অন্য পরিবারের কর্তা ব্যাগভর্তি বাজার করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসাথে খাবার গ্রহণ করে। শুধু ব্যবস্থাপনা ও চিন্তাগত ভিন্নতার কারণে দুই কর্তার কর্মের পার্থক্য পরিলক্ষিত। গ্রামাঞ্চলে বা শহরেও কিছু পরিবারে দেখা যায় দিনের পর দিন অভাব অনটন বা ঝগড়া-বিবাদ লেগেই আছে। আবার তার পার্শ্ববর্তী অন্য পরিবারে তার লেশমাত্রও নেই। একটু খোঁজ নিলে সহজেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কথায় আছে- "রাজার দোষে রাজ্য অন্ধকার"।

নেতৃত্বের সংজ্ঞা বা উদাহরণ যাই বলি, পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি তিনজন ব্যক্তির মাঝেও তাই বোঝায়। সমাজের সকল অধিবাসীর চোখগুলোর সমন্বয় নেতার দু'চোখ? মনে করতে হবে নেতা যখন ঘুমায় পুরো সমাজও ঘুমায়। নেতা যখন নিথর-নিস্তব্ধ, সমাজও নিথর-নিস্তব্ধ। নেতা যখন কোনো কিছু দেখেও না দেখার ভান করে, সমাজও তখন অন্ধত্ব ধারণ করে। নেতা যখন ভালো-মন্দ পার্থক্য করার শক্তি হারিয়ে ফেলে, সমাজেও বধিরের সংখ্যা বেড়ে যায়। নেতা যখন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, জনসাধারণ তাকে অনুসরণ করতে শুরু করে।

যোগ্য নেতৃত্ব তার অধিবাসীদের যেমনি দিয়েছে আনন্দ, তেমনি সৃষ্টি করেছে কর্ম। যে কর্মের মধ্য দিয়েই কর্মীরা খুঁজে পেয়েছে তাদের কাজ, দায়িত্ব ও কর্তব্য। নেতার অন্যতম দায়িত্ব নিজে যেভাবে কর্ম সম্পাদন

www.pathagar.com

করবেন, কর্মী বাহিনীর মাঝেও কর্ম বণ্টন করে দেবেন। নচেৎ তার ব্যতিক্রম ঘটবে। একটি প্রবাদ বাক্য আছে "বেকারের মাথা শয়তানের দোকান"। কর্মী বাহিনী কাজের অভাবে হবে সমালোচনামুখর, নিস্তব্ধ ও অযোগ্য। সময়ের ব্যাবধানে হয়তো কর্মী বাহিনী খুঁজে পাওয়াও দূরূহ হবে। এক সময়ে দেখা যাবে নেতা, নেতৃত্ব, সাম্রাজ্য ও জনসাধারণ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু সবকিছু মরিচা ও উইপোকা খেয়ে ফেলেছে।

নেতার নেতৃত্ব যেমনি পুরো সমাজ পরিবর্তন করে দিতে পারে, তেমনি জাহাজের পাটাতন কাত হয়ে ডুবে যাওয়ার মতো সমাজটাকেও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে পারে। পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে অদ্যাবধি যতো মহানায়ক নেতৃত্ব দিয়েছেন, হয়তো তাদের অধীনে পরিচয় দেওয়ার মতো লোকও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু নেতৃত্বের বলিষ্ঠতায় অধীন ও কর্মী বাহিনীর মাঝে কর্ম সম্পাদনে ব্যাপক আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে, যা সমাজকে সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে রূপ দিতে সহায়ক হয়েছে।

নেতার এক পা অগ্রসর হলে কর্মী বাহিনীর দুই পা অগ্রসর হয়। নেতার এক মিনিটের কাজ, কর্মী বাহিনীর শত মিনিটের কাজ। নেতা যদি সকল কর্মীকে কাজে লাগাতে পারেন, যে কাজ তিনি এক ঘণ্টায় সম্পাদন করতেন, সেটি সম্পন্ন হবে এক মিনিটে। সেজন্য নেতাকে কাজ করা থেকে কাজ বের করার চিন্তাই বেশি করতে হয়। নেতা যদি চিন্তাহীন ও অকর্মণ্য হন, তাহলে পুরো সাম্রাজ্যই গতিহীন হয়ে পড়ে।

নেতাকে হতে হয় প্রজ্ঞাবান। নেতৃত্বের অবহেলা ও অসচেতনতার অভাবে সৃষ্ট বিপর্যয়ের ভুক্তভোগী শুধু নেতাই হন না; বরং সাম্রাজ্যের সকল জনসাধারণই হয়। সেক্ষেত্রে নেতৃত্বকে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে জনসাধারণেরও ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে। সত্যিকার অর্থে সাম্রাজ্য বা দেশকে যারা ভালোবাসে, সাম্রাজ্য ও জনসাধারণের ক্ষতি হবে- এমন কর্ম তারা মেনে নিতে পারে না।

সাধারণত পরিবারের কর্তা বা পিতা যদি ভালো ও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হয়, পরিবারের অন্য সদস্য বা সন্তানাদিও সৎ, যোগ্য ও দক্ষ মানবে রূপান্তর হয়। সমাজের চোখেও তারা ভালো হিসেবে বেড়ে ওঠে। এমনকি অসৎ সন্তানও সৎ হয়, শুধু পরিচালনার কারণে। অন্যথায় পরিবার প্রধানের ভুল-ত্রুটির কালিমা অন্য সদস্যদের ওপরও লেপন হয়। নেতৃত্বের নজরানা পেশ করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী, যাঁর নেতৃত্বের বলিষ্ঠাতা ও জীবনধারণ পর্যালোচনায় মাইকেল এইচ হার্ট তাঁর "একশ মনীষী"-এর জীবনী গ্রন্থে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছেন। যিনি নেতার অন্যতম গুণ- এমন নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী তৈরি করেছিলেন যাঁরা তাঁর ইন্তেকালের পরও তাঁর আদর্শানুযায়ী দীর্ঘকাল রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন।

www.pathagar.com

এমনকি অর্ধ পৃথিবী শাসনের নজিরও তাঁরা দেখিয়েছিলেন।

নেতার অন্যতম গুণ যাবতীয় ভয়ভীতি, লোভ-লালসাও প্রদর্শনেচ্ছার ঊর্ধ্বে থেকে সঠিকভাবে কর্ম সম্পাদন করা। প্রয়োজনে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে যারা একটুও দ্বিধাবোধ করে না। অসংখ্য দৃষ্টান্তও যার রয়েছে। দেশ, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষায় পৃথিবীবাসীর নিকট তাঁরা হয়ে থাকেন চিরভাস্বর।

একজন সমাজপতির জন্য বড় সতর্কসঙ্কেত নিজে তোষামোদি হওয়া ও অন্যের তোষামোদি গ্রহণ করা। যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ধীরে ধীরে নিম্নমানে পৌঁছায়। তদারকি করা ও হেঁটে হেঁটে জনসাধারণের সর্বশেষ অবস্থা জানা সফল নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এটি উদীয়মান কোনো বিষয় নয়। সিংহাসনে বসে যারা রাজ্য পরিচালনা করতে অভ্যস্ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তোষামোদি দ্বারাই তারা প্রলুব্ধ হয় ও দিকভ্রান্ত হয়। একপর্যায়ে হিতাহিত জ্ঞান ও নৈতিক শক্তিও তাঁরা হারিয়ে ফেলে। নেতাকে সর্বদা স্মরণে রাখা তিনি স্রষ্টার একজন প্রতিনিধি। স্রষ্টার কর্মনীতিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নই তাঁর কাজ। ভাবনার বিষয় হচ্ছে নেতৃত্বের আসন থেকে বিষয়টিকে কতোটুকু অনুধাবন করতে পেরেছে।

www.pathagar.com

সময়ের শপথ ও স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা

যদিও এখনও বিদেশ সফর হয়নি; সেদিন এক অডিটোরিয়ামে একটি মুভি দেখতে গিয়ে বিদেশী কিছু জনপদ ও বাসিন্দাদের জীবনাচরণ খুব সহজেই নজর কাড়লো। অনেকটাই ভাবুক হয়ে গেলাম কী-ই তাঁদের কাজ? কেনইবা ধরাতলে তাঁদের আগমন? বেঁচে থাকার জন্য অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থানের ব্যবস্থা ও টিকে থাকার সংগ্রাম। আবার আরেক শ্রেণী আনন্দ বিনোদন, ফুর্তিতে বেশ মশগুল। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার দিকে যদি তাকাই- এ থেকে ব্যতিক্রম নয়।

সমাজের সিংহভাগ মানুষই নিদ্রার সময়টুকু বাদে পুরো সময়টাই ব্যয় করে আহার জোগাড়ের অর্থ উপার্জনে। হাতেগোনা যে কয়েকজনই এর ব্যতিক্রম, তাঁদের সময় ব্যয়ের পরিসংখ্যান হচ্ছে আড্ডা, নিদ্রা ও উদ্দেশ্যহীনতায়। বড়ই আফসোস- আহার জোগাড়ের জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে যে সময়টুকু ব্যয় হয়, তা গ্রহণে তার সামান্যতম অংশও প্রয়োজন হয় না। উপার্জনে ব্যয় হওয়া সময়ের হিসাব বাদই দিলাম। যে খাবার তৈরিতে এক থেকে দুই ঘন্টা ব্যয় হয়; কিন্তু তা গ্রহণে দশ মিনিটেরও প্রয়োজন হয় না। এমন অনেক নজিরও রয়েছে- রাঁধুনির হাত ধোয়ার আগেই খাওয়ার কাজটি শেষ হয়ে যায়।

একটু ভেবে কি দেখেছেন- একজন কর্মজীবী সকালের ঘুম ভাঙা থেকে শুরু করে রাতে নিদ্রার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত, ক্ষুদ্র গন্ডিতে নির্দিষ্ট ফ্রেমেই সময় অতিক্রম করতে হয়। নিজের থেকে কোনো কিছু উদ্ভাবন করা বা উদ্ভাবিত কোনো কাজকে পরিমার্জন করা বলতে কিছুই তার হয় না। এমন অনেক কর্মজীবীও রয়েছে সারাদিন পরিশ্রম করে ঠিকমতো তিনবেলা আহারের ব্যবস্থাও হয় না। বাস্তবতার নির্মমতায় হারিয়ে ফেলে নিজের ভেতরকার সকল সৃজনশীলতা। জীবন সংগ্রামে একপর্যায়ে নুয়ে পড়ে জীবন প্রদীপ। পৃথিবীর এমন অনেক প্রান্ত রয়েছে, যেখানে সভ্যতার ছোঁয়া এখন পর্যন্ত পৌঁছেনি। আবার যারা সভ্যতার ঢাকঢোল পেটায়; তাঁদের অনেকেই জানে না সভ্যতার অর্থ কি? যেখানের মানুষ জানে না তাঁদের কাজ কি? কোথায় তাঁদের গন্তব্য? মানবতা সেখানে বিবর্জিত। যেটুকু আছে শুধু মুখে আওড়ানোতেই সীমাবদ্ধ। মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির বিকাশ যেখানে চিরতরে

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ। আমোদ-প্রমোদ, বিনোদন ও বুলিতেই শুধু সভ্যতার প্রয়োগ ঘটানো হয়।

যাঁর আছে যা কিছু তা নিয়ে নয় তুষ্ট। যাঁর একটি অঙ্গ নেই, আফসোস হারানো অঙ্গের। সৌন্দর্যহীনের আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্যের। দরিদ্রের আশা ধনী হওয়ার। ধনীর লোভ আরো সম্পদের। কিন্তু বিপরীত থেকে চিন্তা করার কেউ নেই। যা কিছু আমার আছে এখন, তার থেকেও নিচু ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে স্রষ্টার দিকে ধাবিত হওয়া। অতৃপ্তি, অপূর্ণতা ও হতাশায় তিলে তিলে জীবন হয়ে যায় শেষ। কিন্তু ভেবে কি দেখেছি কৃতজ্ঞ বান্দাদের স্রষ্টা তাঁর করুণা শতগুণে বৃদ্ধি করে দেন। স্বীয় কর্মদোষের দিকে না তাকিয়ে অভিযোগ এতো মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায়; স্বয়ং স্রষ্টাকেও অভিযোগ করতে দ্বিধাবোধ হয় না। কি চেষ্টা করে দেখেছি, নিজের অবস্থান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর। অলস অকর্মণ্যদের প্রতি স্বয়ং স্রষ্টাও তাঁর করুণার দরজা বন্ধ করে রাখেন। পৃথিবীতে এমন কোনো নজির নেই যে, সাধনার ফল ব্যর্থ হয়েছে। কার্যত দৃশ্যমান না হলেও যে কোনোভাবেই হোক তার সুফল পাওয়া যায়।

সময়ের গতি কতো যে সংকীর্ণ, ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকালে সহজেই অনুভব হয়। স্রোতের গতিকে কিছুটা হলেও রোধ করা যায়; কিন্তু সময়কে নয়। মনে হয় যেন পৃথিবীর একটি মাত্র গতি যাকে থামানো যায় না। 'সময়' স্রষ্টা কর্তৃক একটি পরীক্ষা, কেবল চাক্ষুসমানরাই তা দেখতে পায়। জন্ম থেকে এ পর্যন্ত অনেক পরীক্ষারই আমরা সম্মুখীন হয়েছি; কিন্তু সকল পরীক্ষায় উতরে উঠতে সময়ের আসল পরীক্ষাই হারিয়ে ফেলি।

যে দেহের রক্ত-মাংস, অস্থি-মজ্জা কতো যত্নের সাথে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার সময়ের সাথে ধীরে ধীরে তার ক্ষয় হয়। একটি সময়ে সে দেহটি মাটির সাথে বিলীন হয়ে যায়। তাহলে নিজস্ব সম্পদ বলতে আছে কি? রাত যতো গভীর হয়, পৃথিবী যখন গম্ভীর- নিস্তব্ধ; নিজস্ব বলতে আমাদের কি আছে? কখনও কি কেউ পেরেছে, রাতকে দীর্ঘতর করা? যে সকালের সূর্যের আলো উঠতে দেবে না। আবার স্রষ্টা যদি এমন ইচ্ছে করে রাতকে আর সকাল হতে দেবে না। কারো কি সাধ্য আছে সূর্যকে উদিত করার? রাতের গভীরতা ও নিস্তবব্ধতায় মাঝেমধ্যে মনে হয়, এটিই যেন জীবনের শেষ রাত। কবির আবেগ, লেখকের ভাবনা, প্রেমিকের ভালোবাসা এখাইে যেন শেষ।

অথৈ সাগরের ঢেউগুলো স্রষ্টার সংবাদ বহন করে। কুলকিনারাহীন জলরাশি স্রষ্টার বড়ত্বের পরিচয় প্রদান করে এবং বড়ত্ব একমাত্র তাঁর জন্যই সীমাবদ্ধ বলে জানান দিয়ে যায়। উঁচু পবর্তমালা নীরবে-নিথরে মানুষের অসহায়ত্বের প্রমাণ প্রদান করে। স্রষ্টার প্রতি নত হওয়ার আকুল

www.pathagar.com

আবেদন করে। নচেৎ তাঁর আক্রোশে পাহাড় ধসে জনপদবাসীকে নাশ করে দিতেও পারেন।

সাগরে ডুবে যে প্রাণ হারালো, পাহাড় ধসে যে জীবন হারালো; স্রষ্টার পরিচয় তাকে আর প্রদানেরও সুযোগ নেই। সময়ের সাথে স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পথও রুদ্ধ হলো। সৃষ্টিরাজিকে নিয়ে যে যতো বেশি গবেষণায় মগ্ন হয়েছে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য খুঁজতে চেষ্টা করেছে; স্রষ্টার প্রতিও সে ততো বিনয়ী ও কৃতজ্ঞ হয়েছে।

অনেকেই সামান্যতম খারাপকর্মে তাৎক্ষণিক তার প্রতিফল পেয়ে যান। আবার অনেকে অধিক পরিমাণে অপকর্মে জড়িত হলেও সাময়িক তার ফলাফল পান না। পথভ্রষ্টদের লাগামকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন দীর্ঘস্থায়ী শাস্তির জন্য। সেজন্য স্রষ্টা সময়ের শপথ করেছেন। তার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলরা অবশ্যই সফলকামী হবে। সময়ের মূল্যহীনরা হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

সময়ের গুরুত্ব অনুধাবনকারী অনেকেই স্বীয় কল্যাণে সময় ব্যয় করতে অভ্যস্ত। যা নিছক সংকীর্ণতার পরিচায়ক। যা স্রষ্টার নিকটও অপছন্দনীয়। মানবজাতিকে সৃজন করেছেন একে অপরের সহায়ক ও কল্যাণকামীরূপে। হবে না কারো দ্বারা কারো ক্ষতিসাধন। স্রষ্টার ইবাদত করবে সবাই একাগ্রচিত্তে ও একই কাতারে শামিল হয়ে। বৃহৎ মানবতার কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ হবে একই ছায়াতলে। সৎ ও সেবামূলক কাজে ভরে দেবে জীবনের পুরোটা সময়। ধরাতলটা সাজবে আরো সুন্দরভাবে। হিংসা-বিদ্বেষ, বিভেদ থাকবে না সমাজজুড়ে। স্রষ্টার ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে, পাওয়া যাবে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন।

www.pathagar.com

ক্ষণকালে দীর্ঘ সময়ের কাজ

জন্মের পর থেকেই প্রত্যেক সৃষ্টির বয়স যেমনি বাড়ে, তেমনি তার আয়ু তথা বেঁচে থাকার বয়সও কমতে থাকে। ঘড়ির কাঁটার ধারাবাহিকতায় সময়গুলো দ্রুত পার হচ্ছে। এটুকু জীবনে কতোটুকু সময় আরাম-আয়েশ, ঘুম ও আড্ডায় কাটিয়েছি। এ জগত সংসারকে সাজাতেও নিজের জীবনকে পরিপাটি করতে কতোটুকু সময় অতিবাহিত হয়েছে। এখন সময় এসেছে সময়ের সঠিক অঙ্কটি কষার। যে শিক্ষার্থী শিক্ষাজীবনে অধিক খেলাধুলা, আড্ডা ও নিরর্থক অধিক সময় ব্যয় করেছে কর্মজীবনে সময়ের অঙ্কটি তার নতুন করে কষাতে হয় না; স্বভাবতই আয়ত্ত হয়ে যায়। আবার কর্মজীবন শুরু হতে না হতেই অবসর ও বার্ধক্যের জীবনও চলে আসে। কর্মজীবনের শুরুটা যে যতো বেশি প্রাণময় ও চাঞ্চল্যময় করে নিতে পারে; পুরো জীবনটাই তার ততো কর্মময় ও সার্থক হয়ে ওঠে। যদিও বাস্তবে জীবন অনেক ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ।

সৃষ্টিকুলের মাঝে একটি সৃষ্টিই রয়েছে, যারা অন্য সৃষ্টিদের থেকে স্বতন্ত্র ও আলাদা। এ জগতকে গোছাতে ও অন্য সৃষ্টিদেরও পরিচালনা করার গুরু দায়িত্ব যাদের ওপর বর্তায়; তাঁদের ক্ষমতা বা এখতিয়ার একজন শিল্পীর মতো। যিনি কাদামাটি দিয়ে যেমনি ইচ্ছে তেমনি শিল্প রচনা করতে পারেন। অন্য সৃষ্টিদের জগত ভাঙা-গড়া বা পরিপাটি করার কোনো ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি। মানুষ তাদের বশ করে চলবে? আবার মানুষও যদি স্রষ্টা প্রদত্ত নিয়মের বিপরীতে নিজেদের মনগড়া জগত পরিচালনা শুরু করে, সৃষ্টিকুলও মানুষের সাথে বৈরী আচরণ করতে বাধ্য হয়।

স্রষ্টার ঘোষণানুযায়ী তিনি মানুষকে দুর্বলভাবে সৃষ্টি করেছেন। সামান্য ঝড়ে যারা ভেঙে পড়ে। রোগে কাতরানো শুরু করে, বিপদে হেলে পড়ে। তাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব ক্ষণকালে দীর্ঘকালের পুঁজি সঞ্চয় করা।

আত্মপর্যালোচনায় নিয়ে আসা সময়ের চাকার সাথে নিজের জীবনের গতি কতোটুকু ঘুরেছে। আজকের দিনটি গতকাল থেকে কতোটুকু অগ্রসর হয়েছে। গত বছরের সাথে এ বছরের ভালো-মন্দ পার্থক্য। জীবনের দীর্ঘসময় ব্যয় হয়েছে আত্মকেন্দ্রিকতায়, শিশুকাল থেকেই হয়েছে যার প্রয়োগ শুরু। পড়ালেখা করার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে- ভালো চাকরি

www.pathagar.com

পাওয়া; গাড়ি-বাড়ি করে নিজেই সুখী হওয়া। বাবা-মায়ের উচিত মেধাবিকাশের সাথে সন্তানাদির চিন্তার জগতকে প্রশস্ত করে দেওয়া। নিজের বলতে কিছুই নেই এমন ভাবনা গজিয়ে দেওয়া। সঠিক শ্রমের পেছনে উদ্দেশ্যে থাকবে বৃহৎ মানবতার কল্যাণ সাধন। তাহলে কঠোর পরিশ্রমেও তৃপ্তি পাওয়া যাবে। জীবনটা হবে সার্থক ও সত্যিকার উপভোগ্য।

জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক, গুণী ও সফলকামীদের জীবনী পর্যালোচনায় অনায়াসে ভেসে উঠে শ্রম ও ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাধনার তৃপ্তি তাঁদের এতোটা বিভোর করে রেখেছিল খুবই স্বল্প সময়ের নিদ্রাতে একটুও তাঁরা পরিশ্রান্ত হননি। বর্তমানেও এমন ত্যাগী ও কর্মঠ ব্যক্তিত্বের সন্ধান ফুটে ওঠে। বিছানার আরামকে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ও দীর্ঘকালের প্রস্তুতিস্বরূপ অনায়াসেই যাঁরা বিসর্জন দিয়েছেন।

অনেকেই দীর্ঘ পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। পরিকল্পিতভাবে ধীরে ধীরে পরিশ্রমের মাত্রা বাড়িয়ে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। উদ্দেশ্য ও গতিহীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত যাঁরা। শুধু খাবার, নিদ্রা, ঘরসংসার ইত্যাদি জীবনেই সীমাবদ্ধ তারা? ত্যাগী মহামানবদের দৃষ্টান্ত তাদের জন্য বিষফোঁড়া।

শিশুকাল থেকে শুরু করে বাল্য, কৈশোর, যৌবন শিক্ষা ও বার্ধক্যকাল যেমনি একইসূত্রে গাঁথা। এককালের পরিশ্রম ও কর্মের ওপরই নির্ভর করে পরবর্তী কালের সফলতা ও ব্যর্থতা। মূলত এ ক্ষুদ্র কালগুলোর শ্রম ও প্রস্তুতির মধ্য দিয়েই সবচেয়ে দীর্ঘজীবন মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি নিতে হয়। সেদিন স্রষ্টা তাঁর বান্দাকে অভিযোগ করে বলবে, আমি তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত ও শীতার্ত ছিলাম; কিন্তু তুমি আমার প্রয়োজনগুলো পরিপূর্ণ করোনি। বান্দা বলবে- কিভাবে সম্ভব, তুমিতো সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত।

বিকলাঙ্গ, রোগাগ্রস্ত, অভাবীরা যখন দু'হাত বের করে একমুঠো খাবারের জন্য সাহায্য চায়; শুধু দু'পয়সা হাতে তুলে দিলেই তাদের প্রতি কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। প্রয়োজন বাস্তব পদক্ষেপ। অন্ন, বস্ত্র ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। যে শহরে বাস করে সমাজের সবচেয়ে ধনাঢ্য পরিবারগুলো, সে শহরের রাস্তার ধারে এমন অসংখ্য রোগাগ্রস্তকে পাওয়া যায়, যাদের সমস্ত শরীরে পচন ধরার উপক্রম; কিন্তু তার চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণের নেই কেউ। যেখানে তাদের ডাকে সেবা করার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে স্রষ্টারই সেবা করা হয়। স্রষ্টা সন্তুষ্টি ও অনন্তকালের সফলতার জন্য প্রয়োজন জাতীয় ও সংঘবদ্ধ কর্ম প্রচেষ্টা। যার ধারাবাহিকতায় তৈরি হতে পারে কিছু সমর্থন সংগঠন। যাতে পঙ্গু, রোগাগ্রস্ত ও উদ্বাস্তুদের অন্ন, বস্ত্র, চিকিসা ও

www.pathagar.com

স্থায়ী পুনর্বাসনসহ সামাজিক পরিচয়ের ব্যবস্থা করা যায়।

আপনজন যার সাথে গতকালও আড্ডায় মেতে উঠেছিলেন, আজ সে দীর্ঘপথের যাত্রী। হয়তোবা একটু পর আমাকেও অনেকে হারিয়ে ফেলবে। ছোটবেলা থেকে এযাবৎ কত স্থানে কত সংখ্যক মানুষের সাথে শুধু সাক্ষাৎ নয়, অন্তরঙ্গ সখ্যও হয়েছে। কে কোথায় কিরূপ আছে সবই জানা, শোনা ও দেখার বাইরে। অধিকাংশের সাথে জীবনে আর একবারও সাক্ষাৎ নাও হতে পারে। কত ছোট পরিম-লে ক্ষুদ্র আয়ু নিয়ে আমাদের বাস।

মৃত্যু-পরবর্তী আরেকটি জীবন আছে শুনলে অনেকেই হাঁপিয়ে ওঠে। যুক্তির কষ্ঠিপাথরে নিজেদের এমনভাবে বেঁধে রাখেন, স্রষ্টার ঘোষণানুযায়ী তাদের অন্তঃকরণকে মোহরাঙ্কিত করা হয়েছে। যাদের কান ভালো কথা শোনে না, চোখ সঠিক কিছু দেখে না, অন্তর সত্যকে অনুধাবন করতে পারে না। বড় বড় মজার বিষয়, তাঁরা পরকালের দীর্ঘসময়কে স্বীকৃতি দিতে না পারলেও মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে পারে না। অথচ মৃত্যুই অনন্ত জীবনের প্রথম ধাপ। পরকাল যদি নাই হয়ে থাকে, পার্থিব জগতের অমীমাংসিত বিষয়গুলোর সমাধান কোথায় হবে? পার্থিব যে দোষীর সাজা না হলো বা দোষী ব্যক্তি সাক্ষাৎ প্রমাণের অভাবে নির্দোষ প্রমাণিত হলো, তার বিচার কি হবে? ভুক্তভোগী অত্যাচারিত ব্যক্তির শেষ আশ্রয়স্থল কোথায় হবে?

তালিকা করে দেখুন পূর্বপুরুষদের কয়জন স্বেচ্ছায় পার্থিব জীবনকে আরো দীর্ঘ করার সুযোগ পেয়েছে। দু'চোখ বন্ধ হওয়ার দেরি, মাথার নিচের বালিশটাও কেড়ে নিতে দ্বিধাবোধ হয় না স্বজনদের। নিথর-নিস্তব্ধ শরীর ক্রমে ঠা-া বরফে পরিণত হয়। প্রিয়জনদের কান্নার গতি ধীরে হালকা হয়ে আসে, এমনকি মৃতদেহের কাছেও বেশিক্ষণ থাকতে রাজি নয়। কোথায় কিছুক্ষণ পূর্বের বালিশ-তোষক, কম্বলের প্রয়োজনীয়তা। নিমেষেই ম্লান হয়ে যায় সব। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ না হতেই নববধূকে গোসল, সাজসজ্জা করে বরপক্ষ চেষ্টা করে যতো দ্রুত বাড়ি নিয়ে যেতে। তেমনি মৃতদেহেরও গোসল, সাজসজ্জা ও জানাজার দেরি, এক সময়ও কালক্ষেপণ করতে প্রস্তুত নয় স্বজনেরা। নববধূ বাপের বাড়ি ফেরার আশা থাকা সত্ত্বেও কান্নার রোল পড়ে যায়; অথচ দীর্ঘপথের যাত্রী আর ফিরে আসে না। আপনজন হারানোর বেদনা অনেক কষ্টকর। তবুও কিছুদিন পর সে শোকটিও হারিয়ে যেতে বসে সকলে।

স্বভাবতই মনের জানালায় প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দেয়। কবরে রেখে আত্মীয়স্বজন?? বাড়ি ফিরেই এলো; কিন্তু মৃতব্যক্তি সেখানে কি করবে? তাঁর দেহ কি মাটির সাথে বিলীন হয়ে যাবে। পুনর্জন্মে বিশ্বাসী না, ক্ষণজীবনই যাঁদের সব? একটু চিন্তা করে দেখুন, পুনর্জন্মে বিশ্বাসী না হলে মানুষ আরো পাপাচারী ও হিংস্র হয়ে উঠতো। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে তাদের

www.pathagar.com

সাথে অন্য সৃষ্টির কোনো পার্থক্য থাকতো না। আসলে পৃথিবীটা এখন পর্যন্ত টিকে আছে বিশ্বাসীদের দ্বারাই। বিশ্ববাসীর সংখ্যা যতো কমবে পৃথিবী ততো ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হবে?

যেখানে পরকালে বিশ্বাস মানুষকে আরো অধিক আত্মপ্রত্যয়ী ও কর্মঠ করে তোলে। পরকালে বিশ্বাস পার্থিব জগতে যাবতীয় অত্যাচার ব্যভিচার ও সমাজ গর্হিত কাজ থেকে মুক্ত থেকে সমাজ বিনির্মাণের প্রতি উৎসাহ জোগায়। জগতের ভালো-মন্দ কর্মের পুণ্য ও শাস্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে। অনন্ত জগতের বিশ্ববাসীর সংখ্যা যতো বাড়বে, ক্ষণজীবন- তথা পার্থিব জগতকে সাজাতে ও সুন্দর করার মানব সংখ্যা ততো বৃদ্ধি পাবে। সমাজ থেকে পাপাচারীর সংখ্যা আরো কমবে। যেহেতু দুনিয়ার ক্ষুদ্র জীবনই দীর্ঘজীবনের সফলতার কর্মক্ষেত্র।

সময়ের প্রতিটি ক্ষণকেই স্মরণীয় করে রাখার উদগ্রিব হওয়া চাই। বিশ্রাম, বিনোদন, আড্ডা ও খাবার গ্রহণেও যেটুকু সময় অতিবাহিত হবে, তা হবে জীবনের পরবর্তী স্তরের প্রস্তুতি স্বরূপ। তাহলে শিশুকাল থেকে পার্থিব জগতের প্রত্যেকটি স্তরে যেমনি সফল হওয়া যাবে। তেমনি এ ক্ষুদ্র জগতের যাবতীয় কর্ম সম্পাদনার মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবনের প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়ে যায়।

www.pathagar.com

দরিদ্রতার কষাঘাতে বিপন্ন মানবতা

সৃষ্টি বিন্যাসে একই সমাজে রাজা-প্রজা ধনী-গরিবের পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এমন পার্থক্য কাম্য নয়; একশ্রেণী সম্পদের পাহাড় গড়বে, অন্য শ্রেণী দরিদ্রতার কষাঘাতে নির্মম জীবন অতিবাহিত করবে। মানবতার অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা একে অপরের বিপরীতে আগমন ঘটলেও দিতে পারেনি মুক্তি; বরং দরিদ্রতার কষাঘাতে মানবতা হয়েছে বিপন্ন। কেউ অট্টালিকায় আমোদ-প্রমোদ করবে, আবার কেউ নিদ্রার একটু নীড়ও পাবে না, যা সত্যিই বেমানান।

জাতিসংঘের প্রকাশিত এমডিজি ২০১৪ বার্ষিক প্রতিবেদনে জানানো হয়, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ। আরো জানানো হয়, সারা বিশ্বে যতো অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী আছে, তার ৫ দশমিক ৩ শতাংশের বাস বাংলাদেশে। এ প্রতিবেদনসহ আরো কিছু গবেষণা প্রতিবেদনে জানানো হয়, সারা বিশ্বে ১২০ কোটি মানুষ অতিদরিদ্র। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০০৪ সালে দরিদ্রসীমার নিচে মানুষের বসবাস ছিল প্রায় ৪৫ শতাংশের ওপর, যা বর্তমানে ৩৩ শতাংশের মতো রয়েছে।

৫৬ হাজার ৯৭৭ বর্গমাইলের ছোট এই দেশে প্রায় ১৬ কোটি লোকের বাস, এর মধ্যে বাসস্থানহীন মানুষের সংখ্যা প্রায় ১.৫ কোটি। ২০১২ সালে পরিচালিত বিশ্বব্যাংকের এক জরিপে দেখা গেছে, রাজধানী ঢাকায় প্রতি বছর ৩ থেকে ৪ লাখ নতুন মানুষ যোগ হচ্ছে। যারা রিকশা ও ভ্যান চালিয়ে বা দিনমজুরি করে অর্থ উপার্জনের আশায় ঢাকা আসে। এদের মধ্যে অধিকাংশই এসে ওঠেন নগরীর বিভিন্ন বস্তিতে। ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্সের মাইকেল লিপটন ১৯৮৬ সালে অতিদরিদ্রের একটি সংজ্ঞা নিরূপণ করেন। বলা হয়, যে সকল ব্যক্তি তাদের দৈনন্দিন চাহিদার ৮০ শতাংশ বা তার কম খাদ্যগ্রহণ করে এবং এ খাদ্য জোগানে তাদের দৈনিক উপার্জনের ৮০ শতাংশ বা তার বেশি অর্থ খরচ হয়, তাদের চরম দরিদ্র বলা হয়ে থাকে।

স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিরাজিকে একটা ভারসাম্যের মাঝেই সৃষ্টি করেছেন। এ

www.pathagar.com

ভারসাম্যের কোথাও খুঁত তৈরি হলে অন্যত্র স্বভাবিকতা হারিয়ে ফেলে। তাঁর প্রত্যেকটা সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ মানুষের জন্য শিক্ষণীয়। এ শিক্ষা ও জ্ঞান দিয়েই পৃথিবীকে মানবজাতি গতিময় ও ভারসাম্যপূর্ণ রূপে গড়ে তোলে। মানুষ সৃষ্টিতে স্রষ্টা যদি একটু ব্যতিক্রম পদক্ষেপ নিতেন দেখুন কেমন হতো- যদি মানুষের হাত দুটোকে পায়ের নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখতেন অথবা পা দুটিকে মাথার সাথে সংযোগ করে দিতেন। কত অদ্ভুত ও ভারসাম্যহীন সৃষ্টি হতো। এতো সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে মানুষকে সৃষ্টি করে স্রষ্টা কি জেনে নিতে চান না, কে তাঁর সৃষ্ট উদ্দেশ্যকে জানতে ও ধরাতলে প্রয়োগ ঘটাতে পেরেছে? তেমনি জগত সংসার পরিচালনায় প্রত্যেক সমাজে অর্থনৈতিকভাবে একটা ভারসাম্যতাও প্রদান করেছেন। এমন অনেক সমাজও রয়েছে একজনের পুঞ্জিভূত অর্থ দিয়ে ওই সমাজের শত থেকে হাজারো মানুষের স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ থাকে, কিন্তু আমাদের অর্থ ব্যবস্থা ও দর্শন এমনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এখানে জ্ঞানী, পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীরাও বুঝতে রাজি নয়- জগতের সকল সম্পদ সকলের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণভাবে মালিকানা তৈরি করেছে। এখানে অর্থনৈতিক তত্ত্ব এমনভাবে রচিত হবে না- ধনীর সম্পদের সাথে গরিবের সামান্যতম যেটুকু আছে তাও যোগ হবে। ধনী আরো ধনী হবে, অভাবী আরো অভাবী হবে। অর্থনৈতিক রূপরেখা তৈরিকারীদের মনে হচ্ছে যেন তাঁরা সম্পদশালীদেরই চাটুকার। অথচ যেখানে সমাজে দরিদ্র থেকে চরম দরিদ্ররাই সংখ্যাগরিষ্ঠ আর সম্পদশালীরা মুষ্টিমেয়।

অর্থ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে একটি সুনির্দিষ্ট মাপকাঠিতে। শ্রম ও যোগ্যতা হবে যার মানদ-; শোষণহীন ও সঙ্গতিপূর্ণ কার্যকর অর্থ ব্যবস্থা এখানে তৈরি হবে। ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য থাকবে; কিন্তু তার ব্যবধান হবে না আকাশ-পাতাল। যেখানে একজন মানুষ দিনের পর দিন অভুক্ত থাকে বা ঠিকমতো দু'বেলা খাবার জোগাড় করতে পারে না; পায় না মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই। সেখানে তারই প্রতিবেশী যে পরিমাণ খাবার অপচয় করে, তা দিয়েও হয়তো তার সুন্দর দিন অতিবাহিত হয়ে যেতো। কেন থাকবে এ ভারসাম্যহীনতা? যে সমাজে পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞের অভাব নেই। বড় বড় বিবৃতিতেই যাঁরা সীমাবদ্ধ। একটুও কি তাঁদের গবেষণায় উঠে আসে না; স্রষ্টা সম্পদরাজিকে কারো একক মালিকানায় সীমাবদ্ধ রাখার জন্য প্রদান করেননি। সম্পদশালীর সম্পদে রয়েছে দরিদ্রের অধিকার। তা বাস্তবায়ন করার রূপরেখা মূল দায়িত্ব অর্থনীতিবিদদেরই।

গবেষণার গণ্ডি যদি এমন সংকীর্ণ হয়, যেখানে সমাজের সকল মানুষকে নিয়ে চিন্তার গতি সীমাবদ্ধ থাকবে; শুধু মুষ্টিমেয় অর্থশালীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নেই মুখ্য হবে। তাই পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে পারেনি; বরং দরিদ্র অসহায়দের আরো করেছে শোষণের সম্মুখীন।

www.pathagar.com

আসলে নিজেদের যতো জ্ঞানী- পণ্ডিত দাবি করি না কেন? স্রষ্টা প্রদত্ত জ্ঞানের যতো অভাব হবে ও তাঁর সৃষ্টি উদ্দেশ্য সম্পর্কে যতোই অনভিজ্ঞ হবো; গবেষণা সাধনার নির্যাস হবে অকল্যাণকর ও ফলপ্রসূহীন। বৃহৎ মানবতার কল্যাণ ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনে যা হবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

দরিদ্রতা একটি পরিবার ও সমাজকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের নিম্নপর্যায়ে পৌঁছে। শিক্ষা, উন্নত চিকিৎসা থেকেও তাঁরা হচ্ছে বঞ্চিত। এমনকি দরিদ্রতার কষাঘাতে অনেকে স্রষ্টার নাফরমানির দিকেও ধাবিত হয়। তখন এ দায়ভার নিতে হবে ওই সমাজের পন্ডিত ও সম্পদশালীদেরই। যাঁর একটু বিবেক আছে, তিনি কিভাবে মেনে নেবেন যে সবাই একই স্রষ্টার সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সমাজের একটা অংশ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষার অভাবে নাশ হবে। আর অন্য অংশ বেশ ভালোভাবেই জীবন কাটাবে। সকলে একই স্রষ্টা প্রদত্ত আলো- বাতাস ও প্রকৃতির সুবিধা সমভাবে গ্রহণ করা সত্ত্বেও যখনই 'সম্পদকে' ক্ষমতা প্রয়োগের একটু সুযোগ হিসেবে পেয়েছি; হয়ে উঠেছি স্বার্থপর ও শোষণকারী।

দৈনিক চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও একজন দরিদ্রতার কষাঘাতে তিলে তিলে নুয়ে পড়বে। অন্যজন হাত-পা গুটিয়ে শুধু তামাশা দেখবে; নির্লজ্জাকর তা হবে না। অর্থ ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজানো হবে; পারস্পরিক হাতপাতার পথ হবে চিরতরে রুদ্ধ। বেশ কয়েকজন সমাজপতিকে পাওয়া যায়, যাঁদের চিন্তাধারাই হলো সমাজের অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ হতে দেবে না। সকলকে করে রাখবে তাঁর অধীন। মুলত তাঁদের সদিচ্ছার অভাবেই দরিদ্র ধনীর কাতারে শামিল হয় না।

সম্প্রতি ঢাকার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের অডিটোরিয়ামে একটি অ্যাসেম্বিলি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান, বাংলাদেশের ২ কোটি ২৮ লাখ যুবক বেকার এবং ৩১.০৫ ভাগ দরিদ্র। হতদরিদ্র এ অধিবাসীদের রক্ষা করতে প্রয়োজন যথাযথ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাজের আওতাভুক্ত নিয়ে আসা। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও কর্মসৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্বে নিয়ে আসা। অনাবাদি সকল ভূমিকে আবাদের আওতাভুক্ত করা। কৃষি বিজ্ঞানের মাধ্যমে যুগোপযোগী উন্নত বীজ আবিষ্কার করে স্বল্পভূমিতে অধিক ফসল উৎপাদনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ব্যাপকহারে কলকারখানা সৃষ্টি করা। যৌথ উদ্যোগে অধিক পুঁজি বিনিয়োগ করে বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা। যেখানে অসংখ্য বেকার বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে।

সরকারি উদ্যোগ ছাড়াও জনকল্যাণমূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে দরিদ্রদের মাঝে বিনাসুদে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। যে সংস্থাগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্যই হবে দরিদ্রতা রোধ করা, কারিগরি ও বাস্তবমুখী শিক্ষা পদ্ধতি

www.pathagar.com

চালু করা। যেন একাডেমিক ডিগ্রি অর্জনের পর অন্যের দ্বারস্থ হতে না হয়। শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করে বস্তি ও পথশিশুদের শিক্ষা ও সচেতনতা নিশ্চিত করা। সমাজপতি থেকে রাষ্ট্রনায়ক পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদধারীদের নেতা না হয়ে দায়িত্বশীলের ভূমিকা রাখা। বেতনভুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের চাকরি মনে না করে সেবা হিসেবে গ্রহণ করা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলও দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্তি পাবে।

দরিদ্রতা স্রষ্টা প্রদত্ত একটি করুণাও বটে, যে তা গ্রহণ করতে পারে। দরিদ্রতা তৈরি করে এক ধরনের সাহস ও প্রত্যয়। যা ব্যক্তিকে দুঃখ-বেদনা অতিক্রম করে কালজয়ী মহান কর্ম সম্পাদনে স্পৃহা জোগায়। এমন অনেক মহান সাধক রয়েছেন, যাঁরা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কবি নজরুলের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। কবির ভাষায়-

হে দরিদ্র। তুমি মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান
কন্টক- মুকুট শোভা। দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস।

www.pathagar.com

ভাঙা গড়ার যৌবন

একটি শক্তি, একটি সাহসের নামই যৌবন। যে যৌবন সাহস করে পাহাড়সম অট্টালিকাকেও ভেঙে চুরমার করতে। সাগরের ঢেউয়ের গতিকে কমিয়ে দিতে একটু হলেও করতে পারে হিম্মত। যে যৌবন এতোটুকু গতিহীন নয়, যা প্রাণহীন অসার এক মূর্তি। ইঞ্জিনে যেমন দিতে হয় তেল, যৌবনকে প্রাণচঞ্চল ও কর্মময় করতে প্রয়োজন- 'সাধনা'। যে যৌবন অনর্থক, অলসতায় পৌড়ত্বে পৌঁছেছে, জীবনের মূল্য তা অনুধাবন করতে পারেনি। উপমা তার- মিটি মিটি জ্বলন্ত প্রদীপ; এক ফুঁতে যা হয়ে যেতে পারে নিমেষেই শেষ। যৌবন মানেই নতুন কিছু সৃজন করার প্রত্যয়; সকল মরিকাকে ধুলিসাৎ করে তৈরি করবে পরিপাটি এক বাস্তব জীবন।

এক যৌবন হাজার বার্ধক্যের চেয়েও শ্রেয়। যার মূল্য উপলব্ধি হয় বার্ধক্যে। যৌবনের শক্তি ও তার মূল্য অনুধাবন করতে পারে খুব কমসংখ্যক যুবকই। এমন অনেক যুবকের সাথে কথা বলে জানা গেছে; শিশু থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের কতটি স্তর রয়েছে, সে সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকিফহাল নয়। যাঁরা যৌবনকে গতানুগতিক জীবনের একটি পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করেই ক্ষ্যান্ত। যৌবনকে মনে করে শুধু আনন্দ, বিনোদন ও ফূর্তির সময়; যতো বেশি উপভোগ করা যায়, ততোই সার্থকতা। এটুকু কথা ভুলে যায় অর্জন ও বিসর্জনের মূল্যবান সময় এটিই। যিনি যতো বেশি বিসর্জনের মানসিকতা রাখেন; তিনি ততো অর্জন করতে পারেন। ভোগবিলাস বিসর্জনের হিম্মতকে করে দেয় নষ্ট; যৌবনকে উপভোগের নগদ লাভের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। ফলে যৌবন হারায় তার কর্ম ও গন্তব্য। যৌবনের দাবি জীর্ণশীর্ণ কিছুকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা। প্রাণহীন কর্মে প্রাণের সংযোগ দেওয়া। যে যৌবন অন্তত একটি কর্মের প্রয়াসও ঘটাতে পারেনি, তা ব্যর্থ।

যৌবনের প্রতিটি ক্ষণকেই রুটিনের ফ্রেমে নিয়ে আসা। এখান থেকে একটু সময়ও অপচয়ের নামান্তর না করা। সাধনা করা- প্রতিটি ক্ষণকেই সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ব্যয় করা। আজ ফল আসেনি, কাল আসবে না; কিন্তু তৃতীয় দিন হবে না ব্যর্থ। সাহসিকতা তৈরি করতে হবে বড় বড় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে। সাহসে ভাটার চিহ্ন পড়লে বুঝতে হবে বার্ধক্যের ছায়া যৌবনের সাথে লেপন হয়ে আছে। হতাশা, সাময়িক ক্ষতির আশঙ্কা যৌবনকে যেন

www.pathagar.com

করতে না পারে গ্রাস।

'একতা' যৌবনের সবচেয়ে বড় শক্তি। বিশ্বের সকল যুবককে একই মালার ফুলরূপে গেঁথে নিতে হবে। যৌবনের শক্তিগুলো একই সূত্রে সঞ্চিত হয়ে নতুন অধ্যায় রচনা করবে। গতিহীন চলার পথে গতি পাবে, পথহীন পাবে পথের সন্ধান, অক্ষম অসহায়ের জন্য হবে শক্তি।

জ্ঞানের পরিপক্বতা অর্জনের শুরু হয় যৌবনেই। অবহেলা-অনাদরে যৌবনের যতোটুকু সময় অতিক্রম হবে পরবর্তী জীবনও হবে ততো ক্ষতিগ্রস্ত। যৌবন নির্দিষ্ট কোনো গ-িতে থাকার নয়; সকল সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে পৌঁছবে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে। যৌবনের পূর্বে শিশুকাল, পরে বার্ধক্য; যা অচল প্রাণহীন- যেকালে সাধনা ও ত্যাগের উপমা খুব কমই পরিলক্ষিত। যৌবন অন্যায়-অশ্লীল, ব্যাধিগ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থাকে দিতে পারে এক পরিমার্জিত রূপ। যতো বিভেদ-বিচ্ছেদ, স্বার্থের লড়াই সবকিছুকে করে দিতে পারে মোচন। অবলা-অসচেতন, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনসাধারণের উন্নয়নে যৌবনই সাহস রাখে পদক্ষেপ গ্রহণের; হতে পারে নির্যাতিত- অসহায় মানবতার সহায়ক।

যৌবনই পারে সকল গর্হিত ও পুরাতনকে অবসান ঘটিয়ে একটি সমাজকে ঢেলে সাজাতে। ময়লা-আবর্জনার স্তূপ যেমনি একসময় অকেজো হয়ে পড়ে, তেমনি যে সমাজে মহৎ কর্ম থেকে মন্দ কর্মের জয়গানই বেশি গাওয়া হয়; সে সমাজও বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। যৌবনের আরাধনা হবে সমাজ গড়ার সাধনা। পুরাতন, ব্যাধিগ্রস্ত যা কিছু আছে, সব ভেঙে করতে হবে চুরমার। পুরাতন ঘর ভাঙা নুতন ঘর তৈরির আভাসই প্রদান করে। আদর করে পুরাতনকে জিইয়ে রাখার অভ্যাস যাঁদের, নতুন কিছু গড়ার শক্তি নেই তাঁদের।

প্রত্যেক বস্তুরই একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে, জীবনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। আবার জীবনকে কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত করে, পৃথক কর্মবিন্যাস করা হয়েছে। যৌবনের কর্ম বার্ধক্যের জন্য রেখে দেওয়া, নিছক বোকামি। মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় যৌবন। যার ওপর ভিত্তি করেই রচিত হবে আগামী জীবন। এটি হাতিয়ার পরবর্তীকালের পাথেয় অর্জনের। বার্ধক্যে তৃপ্তি অনুভব ও অনন্ত জীবনের ফল অর্জনের ক্ষেত্র এটি। যে তার যৌবনকে যতো সুন্দরভাবে গুছাতে পেরেছে, প্রতিটি ক্ষণই নতুন নতুন কর্ম সৃষ্টির আমেজে ততো উৎফুল্ল ও সার্থক হয়েছে। যে যৌবনকে হতাশা-ক্লান্তি ও নিদ্রায় বিভোর কওে রেখেছে, সমাজ ও জাতির কল্যাণ দূরের বিষয়, নিজের মঙ্গলও সাধন করতে পারেনি।

কুমন্ত্রণা দানকারী শয়তান সর্বদা চায় যৌবনকে বানাতে তার সঙ্গী। সে চায় না যৌবন ভালো কর্ম ও বৃহৎ মানবতার কল্যাণে কর্ম সম্পাদন করুক।

www.pathagar.com

এতে শয়তানের আধিপত্য ও রাজ্য বিস্তৃতির পরিধি কিছুটা হলেও থাকে কমার আশঙ্কা। সে সাধনা করে মহৎ কর্মগুলোকে যৌবনের মাঝে কর্কশ করে তুলতে। যে যৌবনকে পাপাচারী শয়তান সত্যিই জয় করে নিতে পেরেছে, তা ভালো কথা শুনতে পারে না এবং মঙ্গল কর্ম দেখে শিউরে ওঠে। শয়তান চায় যৌবনের ব্রতকে তার সাধনার সাথে একাকার করে যুবককে সাগরেদে রূপান্তর করতে। তাই বহু যুবক পুণ্য ও পাপের পার্থক্য হারিয়ে হয়ে ওঠে অপরাধী।

যতো কালজয়ী বীর সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন, যৌবনেই তা সম্ভব হয়েছে। এমনকি স্বয়ং স্রষ্টাও তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যতো পয়গম্বরকে পাঠিয়েছিলেন, টগবগে যৌবন অবস্থায়ই তাঁদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ইতিহাস সাক্ষী- যৌবনের মোহনীয় শক্তি সহায়তা করেছে জনসাধারণকে একই ভাবধারায় গড়ে সংঘবদ্ধ করতে।

যাঁরা যৌবনের পূজারি। যৌবনকে নয় বরং যৌবন-ই তাঁদের পরিচালনা করে। যাঁরা যৌবনকে অতি সংকীর্ণরূপে গ্রহণ করে উপভোগের রাজ্যে গা ভাসিয়ে ধ্বংসের অতল গহ্বরে পৌঁছে। একসময়ে তাঁরা মনুষত্ব হারিয়ে, জীব হয়েও জড়ের বেশ ধারণ করে। ত্যাগ নয়, ভোগবিলাসই তাঁদের কাছে মুখ্যরূপে পরিণত হয়েছে। সেজন্য মাঝেমধ্যে যৌবনের খোরাকও দিতে হয়। ত্যাগী মহামানবদের জীবনাচরণ যৌবনের স্পৃহা জাগাতে পারে এবং নতুন তেজ ও প্রাণের সঞ্চার করতে পারে। কোনো যৌবনই চিরস্থায়ী নয়, বার্ধক্যে রূপান্তর হয়ে একসময়ে জীবন নামের সম্পদটিও নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে। কিন্তু জগতবাসী স্মরণ করে রাখবে ক্ষুদ্র জীবনের যৌবনকে ভাঙাগড়ার কাজে হাত দেওয়ার সাহস কার কতোটুকু অর্জন হয়েছে। যেহেতু অধিকতর ঝুঁকি ছাড়া কোনো কর্মেই সফলতা পাওয়া যায় না। যৌবনই ঝুঁকি নেওয়ার অধিকতর উপযুক্ত সময়।

যে যৌবন- কালের গতির সাথে তালমিলিয়ে পথ চলতে শিখেছে, বিপরীত স্রোতে গা ভাসানোর নির্ভীকতা অর্জন করেনি; তা যৌবনরূপী বার্ধক্য। স্রষ্টাও যৌবনকে সুক্ষ্মাতি-সুক্ষ্মভাবে পর্যালোচনার আওতায় রেখেছেন, এ সময়কে কে কতোটুকু কাজে লাগানোর সাধনায় মত্ত হতে পেরেছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com